খান্নাছ

মাহমুদুল খান

ফয়সাল পেশায় একজন সাংবাদিক। গনি মিয়া যেমন অতি সামান্য বর্গা চাষী। মতি খাঁ যেমন একজন অতি সাধারণ গরুগাড়ী চালক। কুবের যেমন অতি নগন্য নায়ের মাঝি। ঢাকা শহরের রাস্তা ঘাটে, অলিতে গলিতে ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার মত কিলবিল করা আদম সন্তান গুলোর মধ্যে রহিম, করিম, বেলায়েত, সাফায়েত, টুটুল, বকুল যেমন শুধুই জনতা- *আম জনতা*। ফয়সালও তেমনি অতি সামান্য, অতি সাধারণ, অতি নগন্য, শুধুই একজন সাংবাদিক- *আম সাংবাদিক*। সাংবাদিকদের সাংঘাতিক বিশেষণে বিশেষায়িত করাটা ইদানিং রসিকতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ফয়সালের সাথে তার ঘনিষ্ঠ জনেরাও এধরণের মস্কারা কখনও করে না। কারণ সাংবাদিক থেকে সাংঘাতিক হতে হলে সেই ব্যক্তিটিকে প্রথমে লাল, নীল, হলদে, গোলাপি বা এই জাতীয় কোন দলের সদস্য হতে হয়। তার সে ধরণের কোন দলীয় পরিচয় নেই। আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে দৈনিক জনপদ নামের এক মাঝারি মানের পত্রিকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক হিসেবে নাম মাত্র দক্ষিণায় ফয়সালের পেশাগত জীবন শুরু হয়। শুধু তার না, তার মত শত শত তরুণ তুর্কী শিক্ষানবিস সাংবাদিকদের পেশাগত জীবনটা এমন করেই শুরু হয়। কিন্তু তারপরেই প্রতিযোগিতা চলে একের পর এক সিঁড়ি টপকানোর। হুড়োহুড়ি, লুটোপুটি, ধাক্কাধাক্কি, লম্ফঝম্ফ, কার আগে কে কয়টা সিঁড়ি টপকাতে পারে, নিরন্তর চলে সেই প্রতিযোগিতা।

ফয়সালের গতর জুড়ে আলসেমি। সিঁড়ি ফিড়ি টপকানো বিগত এক যুগ সময়েও তাকে দিয়ে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ অবধি আঁতুড়ঘর, কি বারান্দা, বড়জোর উঠোনের আশপাশ দিয়েই তার ঘোরাফেরা, বসবাস। দীর্ঘ একযুগ সময়ের পরিসরে, দৈনিক জনপদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক থেকে সিনিয়র রিপোর্টারের পদটি অলংকৃত করে নিজেকে সে ধন্য করেছে। বেতনও বেড়েছে যৎসামান্য। এই বেতনে সংসার নামের চাকাহীন যানটি চলতে চায় না। ঠেলে ঠুলে চালাতে হয়। ঠেলা ধাক্কার কাজে অবশ্য সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে।

সাংবাদিক হিসেবে সাংঘাতিক কিছু না হলেও, ফয়সালের ঝুলিতে অভিজ্ঞতার পরিমাণ ঠাকুরমার ঝুলির চাইতে সামান্য কিছু কম হলে হতেও পারে। দীর্ঘ এক যুগের পেশাগত জীবনে নানা বিচিত্র বিষয়ের ওপর রিপোর্ট তৈরী করেছে সে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়- ঢাকা শহরের হোটেল রেঁস্তোরায় খাবার দাবারের মান, মেস জীবনের সুখ দুঃখ, বস্তি বাসীর জীবন যাত্রা, পুরোনো ঢাকার পূরাকীর্তি মাদক সেবীদের প্রেম ভালবাসা, শিক্ষা ও সন্ত্রাস, আটরশি পীরের না জানা কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশীর ভাগ সময় কর্তব্যের খাতিরে, কালেভদ্রে শখ করে। আবার কখনও সখনও স্রেফ ক্ষ্যাপ মেরেছে দু'চার পয়সা অতিরিক্ত রোজগারের আশায়।

বছর পাঁচেক আগের কথা, সদ্য শাদী করেছে ফয়সাল। মাল কড়ির টানাটানি। নববধুর শখ আহল্লাদ বলে কথা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বন্ধু জহিরুল। জহিরুল হচ্ছে বাংলাদেশের টপ ক্লাশ এক সিনে পত্রিকার ডাকসাইটে সিনে রিপোর্টার। জহিরুল তখন নতুন মুখের হিট এবং হট নায়িকাদের নিয়ে কাজ করছিল। ওর দেশের বাড়ি খুলনার ডুমুরিয়া থেকে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎই একদিন পাড়াত বোনের পত্র এসে হাজির। মেয়েটার মা বাবা কেউ নেই, মামার কাছে মানুষ। পড়ালেখা যত দুর হয়েছে, তার সাথে রুপ আর গুনের ককটেল করে যত দ্রুত সম্ভব ভাগ্নির বিয়ে থা দেওয়ার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাইছেন ভদ্রলোক। উদ্দেশ্য পরকাল এবং ইহকাল, তথা গৃহের শান্তি নিশ্চিত করা। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র এতদ্বাঞ্চলের একজন রইস আদমি, চিংড়ি ঘেরের ব্যবসায়ী। জহিরুল যদি তার প্রেয়সীকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায় তবে যেন পত্র পাঠ ছুটে আসে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ব্যাঁড়াছ্যাড়া অবস্থার জন্য ডুমুরিয়া থেকে ঢাকায় চিঠি পৌঁছুতে দিন দুই বিলম্ব হয়ত হয়েছে, কিন্তু চিঠি পাওয়া মাত্রই জহিরুলের ঢাকা থেকে খুলনা গামী নাইট কোচে সওয়ার হতে কাল বিলম্ব হয় না। জহিরুল চলে গেল তার নায়িকা উদ্ধার করতে। আর ঢাকায় হালের হার্টথ্রব নায়িকা উদ্ধারের গুরু দায়িত্ব পড়ল ফয়সালের ওপর। নায়িকার নাম জেনি।

জহিরুল ঢাকা ত্যাগ করল বুধবার রাতে, আর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সে হাজির হল নায়িকা জেনির ডি ও এইচ এস এর দোতলা বাসভবনে। নায়িকার ড্রইং রুমে সোফায় সামনাসামনি বসে

কথা হচ্ছিল। বড় পর্দায় অর্ধ উলঙ্গ, স্থুলাকায় নিতম্ব দুলিয়ে বৃষ্টিতে ধেই ধেই করে নৃত্য রত নায়িকা জেনির এক রুপ। আর এই মুহূর্তে ফয়সালের সামনে সোফায় বসা জেনির আরেক রুপ। সদ্য স্নান করে আসা সিক্ত কেশ পিঠময় ছড়ানো, পরনে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ী- নীল রং, ম্যাচ করা ব্লাউজ, ঠোটে স্কীন কালার লিপস্টিক- মোটের ওপর অসাধারণ। চোখে মুখে কথা বলছে মেয়েটা। কথা বার্তায় জড়তা নেই এতটুকুও। সাবলীল ভাষায় ফটাফট উত্তর। বাস্তবে যে মেয়ে এত সাবলীল, পর্দায় তার অভিনয়ের এমনতর দৈন্য দশা কেনো বুঝতে পারে না ফয়সাল। কথপোকথনের এক পর্যায়ে ফয়সাল বলে,

- মিস জেনি, ঢাকাই চলচিত্রে অশ্লিলতা- এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মনে হয় তৈরীই হয়ে ছিল এই প্রশ্নটির জন্য নায়িকা। ফয়সালের প্রশ্ন অনেকটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে উত্তর দেওয়া শুরু করে সে

- দেখুন, সংক্ষিপ্ত পোষাকে, অথবা চুম্বন দৃশ্যে অথবা বিছানার দৃশ্যে অভিনয় করার মধ্যে আমি কখনই অশ্লিলতা খুঁজে পাই না। তবে সেসব দৃশ্য অবশ্যই হতে হবে, আমি আবারও বলছি অবশ্যই হতে হবে চরিত্রের প্রয়োজনে। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে একটা নিঃশ্বাস নেয় জেনি। তারপর কনুই দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে ফয়সলের দিকে একটু ঝুঁকে বলে

- অভিনয় হচ্ছে একট আর্ট। আর্ট জিনিসটা আসে একটা বোধ থেকে। এই যে একটা বোধ–––

বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনি একত্রিত করে বোধের পরিমাণটা বোঝানোর প্রয়াস চালায় জেনি। না জেনি তার বোধের ব্যাপারটা বোঝাতে পারে, না ফয়সাল তা বুঝতে পারে। তার আগেই বসার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে একদল খাঁকি পোষাক পরা পুলিশ প্রবেশ করে।

পুলিশ দলের নেতা গোছের লোকটি হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে জেনির দিকে এগিয়ে আসে। ভদ্রলোক খাটো মত, আঁটসাট পুলিশি ইউনিফর্মের নীচ থেকে দশাসই প্রমান সাইজের ভুঁড়ি খানা ফেটেফুটে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটির চোখে ডার্ক সানগ্লাস, পুরুষ্ঠ গোঁফ, কাঁচায় পাঁকায় মেশানো চুলগুলো খাটো করে ছাঁটা। ভদ্রলোকের মাথার দিকে তাকালে মনে হয় যেনো বাদোলো দিনের প্রথমো কদোমো ফুল।

- মিস জেনি, আমার কাছে আপনার বাসায় সার্চ করার ওয়ারেন্ট আছে।

জেনির হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দেয় অফিসারটি। সেই সাথে হাত ইশারায় সিপাইদের অন্দর মহলে যাবার নির্দেশ দেয়।

- অফিসার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নায়িকার কন্ঠে সিনেমাটিক অনুনয়।

- মিস জেনি, আমাদের কাছে খবর আছে যে এই বাড়িটা আসলে একটা মিনি পতিতালয়। দীর্ঘ দিন ধরে––––

কদম ফুল তার কথা শেষ করতে পারে না, তার আগেই সিপাইরা অন্দর থেকে দুই যুবতী কে গরু ঠেলার মত ঠেলতে ঠেলতে ড্রইং রুমে নিয়ে আসে। যুবতীদ্বয়ের সৌন্দর্য্য প্রশ্নাতীত, কোথাও কোন ঘাটতি নেই। বরং ক্ষেত্রবিশেষ সেই সৌন্দর্য্যের মাত্রাটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে বইকি। পুলিশ অফিসারের মেদ ভুঁড়ির মতই সেই বাড়তি সৌন্দর্য্যগুলো পোষাকের আবরণ ভেদ করে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চাইছে। অফিসারটি পালাক্রমে যুবতী দু'জন এবং নায়িকা জেনিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সময় নিয়ে নিরিখ করে হিসেব মেলানোর চেষ্টা করে। সবশেষে মনযোগ দেয় ফয়সালের দিকে। এবারে হিসেব মিলে যায়।

- হ্যালো–– হোসেন আলী রিপোর্টিং, ওভার––––– রেডিও ওয়েভে বার্তা পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে হোসেন আলী নামের অফিসারটি।

অত্যধিক বিপদের সময় অথবা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না ফয়সাল। উত্তেজনা এবং নার্ভাসনেসের প্রভাবে তার হাত পা পারকিনসন্স রোগীর মত কাঁপতে থাকে, কন্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, জিহব্বায় জগদ্দল পাথর এসে আসন গাড়ে। এই মুহূর্তে ফয়সাল সেরকমই একটা লেজে গোবরে অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে হোসেন আলী দাঁরোগাকে তার পরিচয় এবং নায়িকা গৃহে আসার হেতু বোঝানোর প্রয়াস চালায়। শুষ্ক কন্ঠ তালু আর ভারী রসনা সমন্বয়ে তো তো করে যে শব্দমালা নিগৃহীত হয় তার অর্থ উদ্ধার করা পেট মোটা অফিসারটির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। হন্যে হয়ে পকেট হাঁতড়ে পরিচয় পত্র খোঁজার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। সে চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ

জিনিসটা রয়ে গেছে অফিসের ডেস্কের দেরাজে।

ওসি হোসেন আলী রেডিও ওয়েভে তার শেষ বার্তা পাঠায়

- আসামীরা বমাল জালে আটকা পড়েছে সার, ওভার।

- কি ধরা পড়েছে? ওভার— অপর প্রান্ত থেকে পালটা প্রশ্ন আসে।

- বমাল, মানে খদ্দের সহ পতিতা ধরা পড়েছে সার। অপারেশন সাকসেসফুল। ওভার এ্যান্ড আউট। শেষ কথাটি বলার সময় হোসেন আলীর পুরু গোঁফের তল দিয়ে বিজয়ীর হাসি হীরক চূর্ণের মত ঝলক মারে। সব আশা ভরসা ত্যাগ করে নায়িকা জেনির মূল্যবান মখমলের মোলায়েম কার্পেটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে ফয়সাল।

সেই রাত, পরের দিন এবং রাত মিলে সর্বমোট ছত্রিশ ঘন্টা থানা হাজতে কাটানোর পর শনিবার দুপুরে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পায় ফয়সাল। থানা হাজত না হয় কাটানো গেল। কিন্তু সংসার? *না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায় ।* আদালতের বিজ্ঞ হাকিমকে বোঝানো সহজ, কিন্তু ঘরে বিজ্ঞ এবং সুন্দরী নব বধূকে বোঝানো যে কত খানি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা কেবল ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। তবে সে যাত্রা কোন রকমে উদ্ধার করে খায়রুল ভাই। খায়রুল ভাই হচ্ছে জনপদ পত্রিকার সম্পাদক। পুরো নাম খায়রুল বাশার। বাশার সাহেব নামাজী মানুষ। মুখ ভর্তি সফেদ চাপ দাড়ি, চেহারায় নূরাণী ভাব। সব মিলে ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের কাছে নূরী হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সংসার তরী ডুবতে ডুবতে শেষ মুহূর্তে ভেসে ওঠে। এই ঘটনার পর থেকে ক্ষ্যাপ মারা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে ফয়সাল।

॥দুই॥

নূরী, পুরো নাম নূরজাহান, ফয়সালের ধর্ম পত্নি। নূরীর সঙ্গে তার বৈবাহিক জীবন চলছে মন্দ না। মাসের প্রথম দিকে সম্পর্কটা বেশ মধুর যায়। কিন্তু মাস শেষে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। নূরীর কথা বার্তা, আচার আচরণ, চলাফেরা, সব কিছুতেই কেমন যেন ঝাঁঝ ঝাঁঝ, অম্ল অম্ল ভাব পরিলক্ষিত হয় সেই সময়টাতে। মাস কাবারি গড় পড়তা করলে ওদের জায়া পতির সম্পর্কটা অম্ল
মধুর বলা যায়।

ওদের একমাত্র সন্তান, কন্যা সন্তান টুনটুনি সবে মাত্র চারে পা রাখল। মেয়েটি তার ছোট্ট জীবনে বাবাকে খুব বেশি কাছে পায়নি। ওর যত ওজর আপত্তি, অভাব অভিযোগ, দাবী দাওয়া সব মাতৃ কেন্দ্রিক। কিন্তু তারপরও বাবার প্রতি অসম্ভব টান মেয়েটার। টুনটুনির এখন যে বয়স, তাতে দুনিয়াটাই তার কাছে এক বিশাল জিজ্ঞাসা। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। নূরজাহান মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ধমক ধামক দেয়। আবার মেজাজ বেশী খারাপ থাকলে ঘটনা চড় থাপ্পড় পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে সব ধরণের প্রশ্নের উত্তর টুনি পায়। চড় থাপ্পড় তো দুরের কথা, ধমকটা পর্যন্ত বাবা তাকে কখনও দেয় না। আর সেজন্যই বাবার প্রতি টুনির মহাব্বত দিনকে দিন বেড়েই চলছে।

মাস খানেক হলো মেয়েটার জ্বরজ্বারি লেগেই আছে। দিনের বেলায় ঠিক থাকে কিন্তু রাতে মাঝে মাঝে টেম্পারেচার একশ তিন চার পর্যন্ত ওঠে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। গলির মোড়ের এম, বি, বি, এস ডাক্তার। অসুখ সারার কোন লক্ষণ নেই। বরং ওষুধের রিএ্যাকশনে মেয়েটা দিন কে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রতিদিনই অফিসে যাবার আগে ফয়সালকে তাগিদ দেয় নূরী- মেয়েটার জ্বরজ্বারি তো কমতেছে না। তুমি একটা বার আলম ভাইকে খবর দাও না। উনি যদি ভাল কোন প্রফেসর-ট্রফেসর রেফার করেন।

আলম হচ্ছে ফয়সালের ন্যাংটা কালের বন্ধু। আলমের পেশা হওয়া উচিৎ ছিল প্যাঁচাল পাড়া, কিন্তু ভুল ক্রমে হয়েছে ডাক্তার। মূলত এই প্যাঁচাল এড়ানোর জন্যই ফয়সাল ওর ধারে কাছে চাপে না। তবে ছেলের দিলটা বেশ সাফ ছুতোর।

সেদিন সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হয় ফয়সাল। মতিঝিলে কাগজের অফিসে না গিয়ে সরাসরি হাজির হয় মেডিকেলে। আলমকে বেশি কথা না বলার সুযোগ দিয়ে, আসল উদ্দেশ্যটা সরাসরি পেড়ে ফেলে। খানিক ভেবে উত্তর দেয় আলম

- উম ম, আজকে তো পারব না। কালকে বা পরশু অবশ্যই একবার ঢু মারব। আসলে দোস্ত মনে মনে তরে আমি খুজতেছিলাম।
- কেনো বলত?
- আজকে সাত আট দিন হল আমাদের মর্গে এক মহিলার লাশ পড়ে আছে। কেউ লাশ দাবী করতে আসে নাই এখনও।
- লাশ এখানে আসল কিভাবে? প্রশ্ন করে ফয়সাল।
- বুড়িগঙ্গা ব্রীজের নীচে পাওয়া গেছে। পুলিশ উদ্ধার করে এখানে রেখে গেছে।
দেশের মেডিকেল গুলোর মর্গে এধরণের লাশ হরহামেশাই এসে থাকে। বড়লোকের লাশ হলে দু'চার দিনের মধ্যেই খোঁজ পড়ে। গরীবের লাশ হলে সাধারাণত কোন পরিচয় মেলে না। এসব লাশ নিয়ে হবু ডাক্তারেরা কাটাকুটি করে। রক্ত মাংস দেহ থেকে পরিত্রাণ পায়। শুধু কঙ্কালটা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে ল্যাবের এক কোনায়। কোন কোন ভাগ্যবানের লাশ আঞ্জুমানে মফিদুল- ই-ইসলামের ঘাড়ে চেপে বসে। তারপর(?) শেষ প্রস্থান—– কবরস্থান। ফয়সালের কাছে ব্যাপারটা ব্যতিক্রমি কিছু মনে হয় না। তাই হেয়ালি করে বলে
- এ আর নতুন কি? আঞ্জুমান এ মফিদুল তো আছেই।
- তর কাছ থেকে এরকম আশা করি নাই রে!
হতাশার ছাপ ফুটে ওঠে আলমের চেহারায়।
-আসলে ব্যাপারটা এ্যাজ ইউজুয়াল না। লাশটার একটা কিডনি মিসিং। খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা বা একদিন আগে কিডনিটা শরীর থেকে আলাদা করা হয়েছে। পরবর্তিতে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে মারা গেছে বেচারী।
একটু খানি দম নিয়ে ফয়সালের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করার চেষ্টা করে আলম।
- হুম, স্ট্রেঞ্জ! চলত লাশটা দেখি। যুগপৎ বিস্ময় আর সেই সাথে আগ্রহ প্রকাশ করে ফয়সাল।
আলমের পেছনে পেছনে লাশ কাটা ঘরে প্রবেশ করে ফয়সাল। এ্যালকোহল আর মাংস পঁচার তীব্র গন্ধে নাড়ী উলটে আসার যোগাড় হয় ফয়সালের। কোনরকমে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা মরদেহের পাশে এসে দাঁড়ায়। মরদেহের মুখমন্ডলের অংশ থেকে চাদর সরায় আলম।

'শোনা গেলো লাশকাট ঘরে
নিয়ে গেছে তারে,
কাল রাতে- ফাল্গুনের রাতের আঁধারে,
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ,
মরিবার হল তার সাধ।
বধূ শুয়ে ছিলো পাশে- শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো- জ্যোৎস্নায়- তবু সে দেখিল।
কোন ভুত? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল- লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।'

নিথর, নিস্তব্ধ, চির নিদ্রায় শুয়ে আছে ধরণী থেকে স্বল্প কাল আগে বিদায় নেওয়া এক মনুষ্য সন্তান। লাশের মুখটা অস্বাভাবিক রকমের ফোলা আর ফ্যাঁকাশে। মাথার চুল গুলো জট পাঁকানো। চোখ দুটো হুট করে খোলা, মনি জোড়া গাঢ় বাদামী। ফয়সালের মনে হল যেন মৃতা মহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। মৃত্যুর এতদিন পরেও চোখ দুটো ভীষণ রকমের জীবনত। জীবনত সেই অক্ষিযুগল থেকে যেন ঠিকরে বের হতে চাইছে একাধারে জীবদ্দশার সমস্ত ক্ষোভ, ঘৃনা, আর সেই সাথে করুণ আর্তি- বাঁচার আর্তি। ধীরে ধীরে রুমাল চাপা হাতটা নাক থেকে সরায় ফয়সাল। মাংস পঁচা গন্ধটা এখন আর তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে আঘাত করছে না। ডান হাত দিয়ে মৃতা মহিলার গাল আর কপাল আলতো করে ছুঁয়ে দেয় সে।

সেদিন অফিসে বসে কোন কাজে মন বসাতে পারে না ফয়সাল। ছবি সহ সংবাদটি ছাপার জন্য প্রিন্টিং সেকশনে পাঠিয়ে দিয়েই গৃহ অভিমুখে রওয়ানা করে সে। রাতে টুনির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফয়সালেরও জ্বর আসে। জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখে সে। প্রতিটি স্বপ্নেই মরদেহটি

ঘুরে ফিরে আসে। জটা ধরা চুল, রক্তশুন্য ফ্যাঁকাসে মুখমন্ডল, গাঢ় বাদামী অক্ষি গোলক নিংড়ে বেরিয়ে আসা ক্ষোভ, ঘৃণা, আর্তি- বাঁচার আর্তি।

॥তিন॥

টানা তিন দিন জ্বরে ভোগার পর চতুর্থ দিনের মাথায় কর্ম স্থলে ফিরে আসে ফয়সাল। জ্বর না থাকলেও শরীরটা এখনও অসম্ভব দুর্বল। নিজ ডেস্কে বসে আপন মনে কাজ করছিল সে। নীচতলায় ছাপা খানার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ এখনও শুরু হয়নি। নির্জন দুপুর, আশে পাশের সবাই লাঞ্চে গেছে। চারধারের শুনশান নীরবতা ভেঙ্গে ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বেজে ওঠে। ফোন ওঠায় ফয়সাল।

-হ্যালো, দৈনিক জনপদ।

- হ্যালো, সাম কুম। সালামের ধরণ শুনে ভুরু কুঁচকায় ফয়সাল। আরে বাবা সালাম ভালভাবে দিলে দে, না দিলে তো আর কেউ ধরে এনে দোররা মারবে না!

-আমি আসলে বেওয়ারিশ লাশটার ব্যাপারে ---

লোকটির গলার স্বর কাঁপা কাঁপা, কথা বলার ধরণ কিছুটা মেয়েলি টাইপের।

-বেওয়ারিশ লাশ -- হ্যা হ্যা বলেন, উদগ্রীব হয়ে ওঠে ফয়সাল।

-লাশের চুল গুলো কি জটা ধরা ছিল? Was she missing a kidney?

- হ্যা হ্যা, আপনে কে ভাই? আপনে কি লাশের পরিচয় জানেন?

-শান্তি নগর মোড়ে নিরাময় ক্লিনিকে খোঁজ নেন।

-হ্যালো হ্যালো--- পরবর্তি প্রশ্ন করার আগেই অন্য প্রান্ত থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রিসিভার রেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে ফয়সাল। অনেক ভেবে চিনতে সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নেয় সে।

কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছিল বাশার সাহেব। ফয়সালকে কামরায় ঢুকতে দেখে আলাপ সংখিপ্ত করে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

- তারপর বল, তোমার লাশের কোন হদিস মিলল?

-আসলে এ ব্যাপারেই আপনার সাথে ---, মিনিট পাঁচেক আগে একটা ফোন আসছিল। লোকটা কোন পরিচয় দেয় নাই, শুধু বলল- শান্তি নগর মোড়ে নিরাময় ক্লিনিকে খোঁজ নিতে। ভাবতেছি পুলিশের সাথে কথা বলব। আপনে কি বলেন বাশার ভাই?

জিভে কামড় দিয়ে ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ে বাশার সাহেব- খবরদার ভুলেও এই কাজটা করবা না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে না। তুমি আগে ক্লিনিকে যাও, দেখো কিছু উদ্ধার করতে পার কি না। গুড লাক ভাইডি।

ফয়সাল আর সময় নষ্ট করে না, বাশার সাহেবের রুম থেকে বেরিয়েই ব্যাগ কাঁধে রাস্তায় নেমে পড়ে।

দুই হাজার তিন সনের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। যাচ্চেতাই রকমের গরম পড়েছে এ বছর। তীব্র দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সারাদেশে গরমে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। বৃষ্টি নামার কোন উপসর্গ এপর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অতিশয় দুর্বল কিছু মেঘমালা আকাশে জটলা পাঁকিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি আর সেই সাথে তর্জন গর্জন করে বেড়ায়। কিন্তু যত টুকু গর্জে তাতে এতটুকুও বর্ষে না। ফয়সাল যখন রাস্তায় নামে তখন রাস্তায় একটা রিক্সাও চোখে পড়ে না । অনেকটা হরতাল হরতাল ভাব। আসলে প্রচন্ড দাবদাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে দিবসের যৌবন ভাগে পারত পক্ষে কেউ বাইরে বেরুতে চায় না। শ্রমজীবী মানুষগুলোও কোন পার্কে বৃক্ষ রাজির সুশীতল ছায়াতলে দিবানিদ্রা দিয়ে কোন রকমে সময়টাকে পার করে দেয়।

নিরাময় ক্লিনিক দেশের প্রথম শ্রেনীর গুটি কতক ক্লিনিকগুলোর মধ্যে অন্যতম। চারতলা দালানের পুরোটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। নীচতলার অর্ধেকটা জুড়ে ডায়াগনস্টিক ল্যাব আর বাকি অর্ধেকটায় প্রশাসনিক কাজ কারবারের জন্য নির্ধারিত। বাইরের পাঁচচল্লিশ ডিগ্রী তাপমাত্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পর ফয়সাল যখন ক্লিনিকের সামনে এসে পৌঁছে, তখন সে রীতিমত ঘেমে নেয়ে উঠেছে। স্বচ্ছ কাঁচের স্লাইডিং ডোর ঠেলে সে যখন ক্লিনিকের ভেতর প্রবেশ করে, তখন

হঠাতই এক পশলা ঠান্ডা হাওয়া শূণ্য থেকে উড়ে এসে তার ঘর্মাক্ত দেহে বেহেশতি শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

ক্লিনিকের ইনফর্মেশন কাউন্টারে মাঝ বয়সি এক ভদ্রলোক ডেস্কে ঝুঁকে খুব মনযোগের সাথে কি যেন পাঠে ব্যস্ত। সম্ভবত মাসুদ রানা। লোকটির মাথায় প্রমাণ সাইজের টাক বেলজিয়ামি দর্পণের মত চকচক করছে। কিছু কিছু লোক আছে যাদের দেখলে মনে হয় যেন জগৎ সংসারের প্রতি তারা যারপর নাই তিক্ত বিরক্ত। ডেস্কে বসা লোকটি সেই গোত্রের। ভদ্রলোকের হিটলারি গোঁফ, গোঁফের ওপর থ্যাবড়ানো নাক, নাকের ওপর কালো রঙ্গের মোটা ফ্রেমের চশমা, আর তার ওপর কুঞ্চিত কপালে রাজ্যের বিরক্তি।

গলা খাকারি দিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায় ফয়সাল। লোকটি তার দৃষ্টি বইয়ের ওপর নিবদ্ধ রেখেই চশমার ফাঁক দিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকায়।

-ভাই সাব আমি একজন রোগী, মানে রোগিণীর খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

-নাম কি? লোকটি এবারে বই ভাঁজ করে সরাসরি অগন্তুকের দিকে তাকায়। ফয়সাল বইয়ের কভারের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের পরিচয় দেয়। যা ভেবেছিল তা না। লোকটি আসলে একটা অনুবাদ পড়ছিল- হেনরী মিলারের 'সেক্সাস'। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে লোকটির কুঞ্চিত কপাল আরেক ধাপ সংকুচিত হয়। আগের কথার জের টেনে ফয়সাল বলতে থাকে

- সপ্তাহ দুই আগে এই ক্লিনিকে এক মহিলার কিডনি রিমুভ করা হয়েছিল। আমি সেই মহিলার ব্যাপারে কিছু ইনফর্মেশন চাচ্ছি।

- সরি, এভাবে যে কাউকে যে কোন ইনফর্মেশন দেওয়া আমাদের নিষেধ আছে। আপনাকে উপর থেকে পারমিশন নিতে হবে।

-ওপর বলতে কয় তলায়?

ফয়সালের কথা শুনে লোকটি তার থ্যাবড়ানো নাকের ওপর থেকে চশমা খুলে ডেস্কের ওপর রেখে রাগতঃ স্বরে বলে- আপনে কি নিজেরে খুব শেয়ান ভাবেন, না? উপর বলতে আমি তলা বুঝাই নাই। আপনাকে উপর মহল থেকে পারমিশন আনতে হবে। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন? লোকটি হঠাৎ এরকম উত্তেজিত হল কেন বুঝতে পারে না ফয়সাল। তাড়াতাড়ি অনুতাপের সুরে বলে- ও, সরি ভাই, আপনে শুধু শুধু রাগ করছেন। আমি আসলেই ব্যাপারটা ধরতে পারি নাই। তা কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে দয়া করে যদি একটু বলতেন।

-এই যে Hall way-টা দেখছেন? তর্জনি দিয়ে দিক নির্দেশনা করে লোকটি। উপর নীচ মাথা নাড়ে ফয়সাল।

-Hall way ধরে সোজা চলে যান নাক বরাবর। শেষ মাথায় গিয়ে ডানে মোড় নিলে বা দিকে চার নম্বর রুম, ১৫৪ ডি। একদমে কথা শেষ করে সাবেকি কায়দায় পাঠে মনোনিবেশ করে লোকটি।

নির্দেশিত পথ ধরে ১৫৪ ডি নম্বর কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় ফয়সাল। দরজায় নাম ফলক- ডঃ আশরাফ তালুকদার (এম, ডি), ডেপুটি ডিরেক্টর। বাংলাদেশের ডাক্তারদের নামের শেষে সাধারণত দু'তিন লাইন পর্যন্ত শুধু ডিগ্রীর ফিরিস্তি আঁটা থাকে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের নামের শেষে শুধু এম,ডি উল্লেখ থাকায় খানিক স্বস্তি পায় সে। দরজায় ঠক ঠক দুটো টোকা মারার সাথে সাথেই ভেতর থেকে ভরাট কণ্ঠে আওয়াজ আসে

- কাম ইন।

বাইরের ফলকে নাম, ডিগ্রী, পদবি আর ভরাট কণ্ঠ শুনে ভেতরে পেট মোটা বয়স্ক কাউকে আশা করেছিল সে। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ভদ্রলোকের বয়স তিরিশ থেকে পয়ত্রিশ, ক্লিন সেভড, ফর্সা মত, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মাথা ভর্তি ঘন কুচকুচে কালো চুল। আগন্তুককে দেখে প্রসন্ন হাসি দিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে

- হ্যা, বলেন হাউ মে আই হেল্প ইউ?

ফয়সাল প্রথমে নিজের পরিচয় দেয়। তারপর ঘটনাটা আদ্যপান্ত খুলে বলে। সব শুনে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে ভদ্রলোক। অতঃপর বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সরাসরি ফয়সালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে- ওয়েল ফয়সাল সাহেব ঘটনাটা দুঃখ জনক। আই ফিইল একস্ট্রিমলি সরি ফর দ্যাট পোর লেডি। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার উচিত ছিল পুলিশের মাধ্যমে আসা। এনি ওয়ে, আমি আপনাকে সাহায্য করব যতটুকু পারি। ঘটনাটা কবে নাগাদ ঘটেছে বললেন?

-আজকে তো জুনের ছয়, দিন পনের আগে, তা ধরেন মে'র থার্ড অথবা লাস্ট উইকে হবে।
-উম ম, আপনি এক কাজ করেন- কাউন্টারে—— নাহ থাক আমিই যাচ্ছি। আপনে এখানটাতে বসেন। আমি আসছি।
ফয়সালকে বসিয়ে রেখে ভদ্রলোক রুম থেকে বেরিয়ে যায়। ফেরে মিনিট দশেক বাদে, হাতে এক টুকরা কাগজ, ওষ্ঠে বিজয়ীর হাসি। চেয়ার টেনে বসতে বসতে ফয়সালকে উদ্দেশ্য করে বলে
- মিস্টার আহামেদ, আপনি লাকি বলতে হবে। গত তেইশে মে এখানকার ওটিতে একটা কিডনি রিমুভাল হয়েছে। পেসেন্টের নাম মোসাম্মৎ মেহেরুন্নেসা, বয়স পঁয়ত্রিশ, ঠিকানা ২৩/১এ ডি আই টি প্লট, গেন্ডারিয়া, ঢাকা। এই পর্যন্ত বলে একটু দম নেয় ডঃ তালুকদার, সেই সাথে কাগজে লিখা নাম ঠিকানা ফয়সালের হাতে ধরিয়ে দেয়।
-এই খানে সব লিখা আছে। আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন? মহিলাকে অপারেশনের পরদিনই ডিসচার্জ করা হয় এবং তা জীবিত অবস্থায়।
-অপারেশনটা কে করেছিল?
-ডঃ চৌধুরী, মাহবুবুল আলম চৌধুরী। এই ক্লিনিকের কর্ণধার, আমাদের চেয়ারম্যান। উনি পরশু দিন ইউ কে গেছেন, একটা সেমিনারে যোগ দিতে। উনাকে সাহায্য করেছিল দু'জন নার্স, আর একজন জুনিয়র সার্জন। আনফর্চুনেটলি নার্স দুজনই ছুটিতে আছে, আর জুনিয়র সার্জন আতাহার সাহেবের আজকে ডে অফ। কালকে সকালে আসেন পেয়ে যাবেন।
উচ্চ পদস্থ একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এতটা সাহায্য পাবে বলে ভাবেনি ফয়সাল। চাদর না চাইতেই লেপ তোষক সব পাবার আনন্দে উৎফুল্ল হয় সে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলে- থ্যাঙ্কস ডাক্তার সাহেব। আসলে আমি এতটা আশা করিনি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? ব্যক্তিগত অবশ্য।
-কি?
-আপনি কি খুব রিসেন্টলি স্টেইটস থেকে এসেছেন?
-হ্যা, কেনো বলেনতো?
-না মানে বাইরে থেকে হায়ার এডুকেশন নিয়ে দেশে আসলে সাধারণত সবাই একটু ব্রোড মাইন্ডেড, আর ওই কি বলে উম ম - -হেল্পফুল হয়। অনেস্টও থাকে প্রথম প্রথম। কিন্তু ক'মাস গেলে যে লাউ সেই কদু।
-আপনি আমার প্রশংসা করলেন না বাঁশ দিলেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রশংসা যদি করে থাকেন তবে বলব প্রশংসাটা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আফটার অল নিজের প্রশংসা তো। আর যদি ঐ জিনিস দিয়ে থাকেন তাহলে বলব আমি মোটেই ব্যথা পাই নাই। কারণ আমি ঐ গোত্রের মধ্যে পড়ি না। হো হো হো।
অট্টহাসি দিয়ে ওঠে আশরাফ তালুকদার। লোকটির হাসির প্রশংসা করে ফয়সাল মনে মনে। ভদ্রলোকের হাসিতে প্রাণ আছে- ন্যাচারাল, কৃত্রিম না।
ফেরার পথে ইনফর্মেশন কাউন্টারের লোকটিকে কোথাও দেখা যায় না। অল্প বয়সি এক যুবতি ডেস্কে বসে আছে। মেয়েটা খুব যত্নের সাথে র‍্যাতের মত ধাতব একটা যন্ত্র দিয়ে নিজের সুঁচাগ্র নখের পরিচর্যা করছিল। ফয়সালকে দেখে একটা যান্ত্রিক হাসি দেয় মেয়েটা। ফয়সালও পালটা যান্ত্রিক হাসি দিয়ে ক্লিনিকের বাইরে বেরিয়ে আসে।
বাইরে রোদ অনেকটা পড়ে গেছে। গরমের তীব্রতাও দুপুর বেলার চাইতে সামান্য কম। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে, মাথাটাও ঘুরছে একটু, একটু। আবার বুঝি জ্বর আসবে। একবার জ্বরে পড়লে আবার কয়দিনের জন্য বিছানার সাথে সখ্যতা করতে হয় আল্লাহ মালুম। যাক, যা আছে কপালে- রিক্সায় উঠতে উঠতে বিড় বিড় করে ফয়সাল। তার পরবর্তি গন্তব্য গেন্ডারিয়া।
২৩/১ নম্বর বাড়িটা গেন্ডারিয়া পুরোনো রেল স্টেশনের উলটো দিকে, একেবারে মেইন রাস্তা ঘেঁষে। বড়জোর দুই ডেসিমাল জমির ওপর ছয়তলা বিলডিং তাল গাছের মত শাখা প্রশাখা হীন ধেই ধেই করে খাড়া আসমানের দিকে উঠে গেছে। প্রতিটি তলায় আবার দুটো করে ফ্লাট, মাঝখান দিয়ে সরু সিঁড়ি। নীচতলায় সিঁড়ির ডান পাশের দরজায় খড়ি মাটি দিয়ে লেখা ২৩/১এ। কলিং বেল টেপে ফয়সাল ভয়ে ভয়ে। মিনিট খানেক পর দরজা খোলে এক মহিলা। চেহারা দেখে মহিলার বয়স বোঝার উপায় নেই। পঁচিশও হতে পারে আবার পঁয়ত্রিশ হবার সম্ভাবনাও

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মহিলার পরনে পুরোনো সুতির কাপড়, আঁচল কোমরে প্যাঁচানো, হাতে ময়লা ন্যাকড়া-ঘর দোর গোছাচ্ছিল মনে হয়।
-কাকে চান? মহলার কণ্ঠ বেশ কর্কশ, মাস্টারনি মাস্টারনি ভাব।
-আমি ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক জনপদ থেকে এসেছি। এখানে কি মিস মেহেরুন্নেসা নামের কেউ থাকেন?
-হ্যা, আমিই মেহেরুন্নেসা। কোথা থেকে আসছেন বললেন? দৈনিক জনমত?
-না না জনমত না, জনপদ। মেহেরুন্নেসার ভুল শুধরে দেয় ফয়সাল।
-ও আচ্ছা যাই হোক। কি ব্যাপার ?
-আমি কি ভেতরে এ ––
-ও হ্যা, সরি, আসেন। লজ্জা পায় ভদ্রমহিলা। হাত থেকে ময়লা ন্যাকড়া ঘরের এক কোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাড়ির আঁচল ঠিক ঠাক করে নেয়। বসার ঘরটা অতিশয় অগোছালো। মেঝেতে, সোফায়, কার্পেটে মোটের ওপর ঘরময় বাক্সপেটরা স্তুপ মারা।
-সরি ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে। আসলে আমরা এ বাসা ছেড়ে দিচ্ছি তো। এখানটায় কষ্ট করে বসেন। সোফার এক কোনায় ফাঁকা জায়গা আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে মেহেরুন্নেসা।
-ইটস অলরাইট, বসতে হবে না। তা কোথায় যাচ্ছেন?
-মফস্বলে। আপনি কেন এসেছেন তা কিন্তু এখনও বলেন নাই।
-ও হ্যা, আমি আসলে এসেছিলাম একজন পেসেন্টের খোঁজে। গত মাসের তেইশ তারিখে তার একটা কিডনি রিমুভ করা হয়েছিল- আপনার নামে নাম, ঠিকানাও এক। কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল ইনফরমেশন পেয়েছি আমি।
-না না, মানে হ্যা, আমিই সেই মেহেরুন্নেসা।
কথাটা বলে চুপ মেরে যায় মহিলা। থমথমে নীরবতা নেমে আসে, কেটে যায় কয়েকটা নিশ্চুপ মুহূর্ত। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মেহেরুন্নেসা পর পর কয়েকবার। তারপর কান্না জড়িত কণ্ঠে ফয়সালকে উদ্দেশ্য করে বলে
-ভাই সাহেব, আপনে কি জন্য এসেছেন আমি জানিনা। কিন্তু আমার এই কিডনি বিক্রির ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে পত্রিকায় ছাপাবেন না। আমি চাইনা যে আমার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি আমার মেয়েটা বড় হয়ে জানুক যে তার মা সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে নিজের কিডনি বিক্রি করেছে। কথা শেষ করার আগেই মহিলা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

কারো কান্না- বিশেষত মেয়েদের কান্না ফয়সালকে অতিশয় আবেগপ্রবন করে দেয়। এই মুহূর্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরত এক কিডনি হারা মেহেরুন্নেসার জন্য তার ভীষণ মায়া হয়। কিছু একটা বলে মহিলাকে সান্তনা দেয়া দরকার। কিন্তু সান্তনা দেবার মত কোন যুতসই ভাষা খুঁজে না পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে।

॥চার॥

বাসায় ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশ বেজে যায়। বাবার আগমনের শব্দ শুনে দৌঁড়ে এসে কোলে চড়ে টুনটুনি। মেয়ের দুগালে চুমু দিয়ে কপালে হাত রাখে ফয়সাল।
- বাহ এইতো আমার মায়ের শরীরে এখন একদম জ্বর নেই।
-বাবা, ও বাবা তোমার ফিরতে এত দেরি হলো কেনো?
বাবাকে ঘিরে ছোট্ট টুনির প্রতি দিনের প্রশ্ন পর্ব এই প্রশ্নটি দিয়েই শুরু হয়।

রাতের রান্না সেরে ঘরটা ধোয়া মোছা করছিল নূরী *খুট খাট* আওয়াজ করে। কিন্তু ফয়সালের গলার আওয়াজ পেয়ে সেই *খুট খাট* আওয়াজ আর *খুট খাট* থাকে না - *ধুপ ধাপে* রুপ নেয়। মরিচের গুড়ার কৌটাটা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি শব্দ করে মিটসেফের তাকে তুলে রাখে নূরী। চিনির ডিব্বার মুখা আটকানোর সময় আওয়াজ হয় ধপাস করে। মিটসেফের পাল্লা লাগানোর সময়ও শব্দ হয় প্রায় চারগুণ। এর সবই ঝড়ের পূর্বাভাস। মাসের শেষের ঝড় হঠাৎ মাসের শুরুতেই এসে গেছে বুঝতে পেরে মেয়েকে কোলে নিয়ে মানে মানে শোবার ঘরে কেটে পড়ে সে।
- ও বাবা, মা তোমাকে সারাক্ষণ বকে কেনো?

- ক হ ই - বকে না তো।
- মাকে তুমি ভয় পাও, না বাবা?
- পা আ ই, মাঝে মাঝে। মাসের শেষে। জামা কাপড় বদলানোর ফাঁকে ফাঁকে বাপ বেটির কথোপকথন চলছিল।
- মাসের শেষে কেনো বাবা?
- মাস শেষে মায়ের হাতে টাকা পয়সা থাকে না তো তাই একটু রাগ টাগ করে আরকি।
- টাকা না থাকলে মা'র রাগ হয় কেনো? আমার কাছেও তো টাকা নেই, আমিতো তোমার সাথে রাগ করি না বাবা। টুনটুনির কথা শুনে হেসে ওঠে ফয়সাল।
- আগে তুমি বড় হও গো মা তখন বুঝবে।
- আমি কবে বড় হবো বাবা? এভাবেই কেনো, কবে, কোথায়, কিভাবে একের পর এক প্রশ্ন চলতে থাকে। নিরলস ভাবে কন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে সে। সওয়াল জওয়াবের এক পর্যায়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে টুনি।

আজকে সকাল থেকেই মেজাজটা চড়ে আছে নূরীর। বাড়িওয়ালার বড় মেয়েটা এক প্রস্থ ঝেড়ে গেছে তাকে। অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের তুলনায় সেই নাকি বেশি পরিমাণ পানি খরচ করে। ওয়াসা, বিদ্যুৎ, আয়কর বিভাগ আর সেই সাথে স্থানীয় মাস্তানদের দিয়ে থুয়ে যা থাকে তা দিয়ে নাকি তার পিতার বাজার খরচাও ওঠে না। রিটায়ার মানুষ, বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়েই তাঁকে চলতে হয়। অন্যরা হয়ত ঘুষ দিয়ে এসব বিল অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু তার পিতা আজিজুল হক অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি- বছর দুই হল হজ্জ্ব করে এসেছেন। ঘুষ নেওয়া এবং দেওয়া- এ দুইই তার অতি সজ্জন পিতার কাছে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ধরণের ন্যাকামি মার্কা কথা বার্তায় নূরীর পিত্তি জ্বলে ওঠে। *ভুতের বেটির মুখে রাম নাম*। আরে বেটি, তোর বাপ কাজ করত রাজউকে। রাজউকের কর্মকর্তারা তো দূরের কথা, ওই বিলডিঙ্গের ইট সুরকি পর্যন্ত উপরির জন্য কুমীরের মত হা করে থাকে। এতই যদি সততার বড়াই করিস, তাহলে খোদ ঢাকা শহরেই দু'দুটো চারতলা বাড়ি কি আসমান থেকে নাজেল হয়েছে? তাছাড়া কথাগুলো বাড়িওয়ালা কি বাড়িওয়ালী অথবা তাদের অবিবাহিতা ছোট মেয়েটা বললে তবু মানানসই হয়। কিন্তু ঝেড়ে গেছে বড় জন, বিবাহিতা। বেটি তুই থাকবি তোর স্বামী সংসার নিয়ে। আর এতই যদি *কাইজা* করার জন্য গলা চুলকায় তবে শাশুড়ী, ননদ, জা, জ্যাঠাইশ- স্বামীর সংসারে এতগুলো খল চরিত্র থাকতে বাপের বাড়ির সামান্য ভাড়াটিয়ার বৌর সাথে গায়ে পড়ে ঠোকাঠুকি কেনো, এ্যা?

বাড়িওয়ালার মেয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে চলে যাবার পর পরই আসে দুধওয়ালা। দুধতো না যেন ঢলঢলে মিনারেল ওয়াটার। ছোট খাটো একচোঁট হয়ে যায় দুধওয়ালার সাথে।

ঠিকা কাজের ঝি, 'বাদশার মা' রোজ আসে সকাল নয়টার মধ্যে। কিন্তু আজকে বেলা বারোটা আবধি তার দেখা নেই। জোহরের আজানের সময় নবাবের বেটি এসে হাজির। এসেই দাবী করে বসে যে এ মাসেই তার বেতন আরো পঞ্চাশ বাড়াতে হবে। এই ওয়ার্ডের কমিশনারের বৌ, নাকি ব্যাটার বৌ, নাকি নাত বৌ তাকে মোটা অঙ্ক অফার করেছে। কিন্তু ঐ বাড়ির পুরুষ মানুষ *গুইল্যানের* কাজের মানুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করার বদঅভ্যাস আছে। গরীবের থাকার মধ্যে আছেই ইজ্জতটা। সেই ইজ্জতই যদি সওয়ালের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তবে টাকা পয়সা দিয়ে কি আর তার জওয়াব মেলে? তারপরও কথা একটা থেকেই যায়। বাঁচতে হলে মানুষকে থাকা খাওয়ার একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা করতে হয়। আর এর জন্য চাই টাকা। টাকা ছাড়া শুধু ইজ্জত ধোয়া পানি সকাল বিকাল নিয়ম করে খেলে না মিটবে খুধা, না ব্যবস্থা হবে বাসস্থানের। যুক্তি অকাট্য।

প্রথমে বাদশার মার দাবী শুনে ভীষণ গোস্বা হয় নূরীর। কিন্তু অকাট্য যুক্তি শুনে সেই গোস্বা পরক্ষণেই হাওয়ায় মিইয়ে যায়। বাদশার মার মত অশিক্ষিতা একজন কাজের মানুষেরও মান সম্মান বোধ আছে। আবার সেই মান সম্মান যথাসম্ভব বাঁচিয়ে, ভাল থাকার জন্য দু'চার পয়সা অধিক রোজগারের বিধি ব্যবস্থাও সে করতে চায়। অথচ এই বোধটুকু তার অতি শিক্ষিত জ্ঞানী স্বামীর হৃৎপিন্ডে ভুলেও ধ্বনিত হয় না।

বাপ বেটির প্রশ্ন উত্তরের সময় নূরী খালি ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। টুনি ঘুমানোর সাথে সাথে

ভেতরের ফুসফুসানি বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত ভেঙ্গে চুরে আছড়ে পড়ে। স্বামীর বিরুদ্ধে নূরীর এন্তার অভিযোগ। তবে অদ্য নিশীথের প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ হচ্ছে- মেয়েকে ডাক্তার দেখানো নিয়ে। বউ এর দিকে ফয়সালের বেখেয়ালি পনা গা সওয়া হয়ে গেছে তার। বিয়ের আগে প্রেমিকা হিসেবে মেয়েদের চড়া মূল্য থাকলেও, বিয়ের রাত থেকে স্ত্রী হিসেবে মেয়েদের মূল্যের ক্রমাবনতি হতে থাকে। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের মত। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই ক্রমাবণতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে তখন তারা হয়ে যায় শুধুই সেক্সের ভেন্ডিং মেশিন। নারীবাদীদের এধরণের হাইপোথেটিকাল তত্ত্ব নূরীর জীবনে আজ আর তত্ত্ব নয়- একেবারে প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু মেয়েটার প্রতি তো ফয়সালের একটা দায় দায়িত্ব থাকা উচিত! কন্যার প্রতি অবহেলা এবং স্ত্রীর প্রতি অবহেলা (যদিও নূরীর ভাষায় এনিয়ে তার কোন অভিযোগ বা আফসোস একেবারেই নেই)- এ দুই মূখ্য অভিযোগের পর আসে সংসারের নিত্য দিনের হাহাকার, চাওয়া পাওয়া, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। রীতি অনুযায়ী এগুলো মাস শেষের ঝগড়া। কিন্তু একবার যখন বাঁধ ভেঙ্গেই গেছে তখন প্লাবনের পানি সবটুকু কূলে আঁছড়ে না পড়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অভিযোগ নামা একতরফা ভাবে পেশ করতে করতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত নূরজাহান একসময় ক্ষান্ত দেয় এবং তারপর উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নাকের পানি চোখের পানি একসাথে মেশাতে থাকে।

সোহাগ করে স্ত্রীর চোখের পানি মোছানোর উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় ফয়সাল। ঝামটা মেরে হাত সরিয়ে দেয় অন্যপক্ষ। একবার, দুইবার, কি বড়জোর তিনবার- চতুর্থ বারের মাথায় আর ঝামটা মারে না সে। পরিবর্তে কাছে টেনে নেয় আঁদরের ছলে বাড়িয়ে দেওয়া হাত। এতক্ষণ যেই মানুষটির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ, সেই অভিযুক্ত মানুষটির উষ্ম নিঃশ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে নূরজাহান। তারপর মোমের মত গলে, ঢলে, লেপ্টে, জাপ্টে একে অন্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আপাত যবনিকা ঘটে সমস্ত অভিযোগের।

ঝড় ঝঞ্জা শেষ। পরিস্থিতি শান্ত, নীরব। ক্ষণেক আগে নূরজাহানের এক রুপ ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আরেক রুপ। যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'জন মানুষ, ভিন্ন দুটি সত্ত্বা। যে কোন প্রশ্ন এখন তাকে করা যাবে নির্ভয়ে, ঝামটা দেওয়া উত্তর আসার সম্ভাবনা শতকরা শুন্য ভাগ। নীরবতা ভাঙ্গে ফয়সাল- আলম আসার কথা ছিল, আসছিল?

- হুম।

- কি বলল?

- চাইলড স্প্যেশালিস্ট ডঃ হুদা না কি যেন নাম। উনার সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্ট, কালকে বিকাল চারটায়।

- ও আচ্ছা।

- ও আচ্ছা কি? মেয়েকে নিয়ে যাবে কে?

- ক্যানো আমি!

- বাহ, এইতো আদর্শ পিতার মত কথা। আচ্ছা, তোমার ডেড বডির কোন পরিচয় পাওয়া গেলো?

দীর্ঘ শ্বাষ ছেড়ে বলে ফয়সাল- নাহ।

তারপর সংক্ষেপে স্ত্রীর কাছে সমস্ত দিনের ঘটনা একে একে খুলে বলে। সব শুনে নূরজাহান বলে

- তোমাকে না কতদিন বলছি যে মেয়েদের সব কথা সবসময় বিশ্বাস করতে নাই!

- করি না তো। তোমার কি মনে হয় তোমার সব কথা আমি বিশ্বাস করছি? বিশেষত বিয়ের আগে তোমার—-

- আহা, রসিকতা না, সিরিয়াস। ঐ মহিলা সাদেকুন্নেসা—-

- সাদেকুন্নেসা না মেহেরুন্নেসা।

ভুল শুধরিয়ে দেয় ফয়সাল।

- একই কথা। মহিলার কান্না দেখে তোমার এইভাবে বিড়ালের মত চলে আসা ঠিক হয় নাই। ব্যাপারটা একবার ঠান্ডা মাথায় ভাবতো। মাত্র কয়দিন আগে মহিলার শরীর থেকে আস্ত একটা কিডনি কেটে নেওয়া হইছে। হিসাব মত এখনও তার বিছানায় শুয়ে থাকার কথা। অথচ তার মধ্যে অসুস্থতার কোন লক্ষণ নাই। আর তাছাড়া অপারেশনের মাত্র একদিন পরই বা তাকে ডিসচার্জ করা হল কেন? কিডনিটা সে কার কাছে বিক্রি করল? মহিলার কি হাজব্যান্ড আছে নাকি সিংগেল

মাদার? স্বামী থাকলে কোথায় আছে? হঠাৎ মফস্বলেই বা মুভ করা কেন? এসব প্রশ্ন তোমার করা উচিৎ ছিল। তা না করে উনি মেয়েলোকের কান্নায় ভিজে, নিজেও কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছেন। আহাম্মক জানি কোথাকার।
- ঠিকই বলছ বউ। আমি আসলে এতটা গভীর ভাবে চিন্তা করি নাই। আচ্ছা নূরী, তুমি তো অনেক রহস্য উপন্যাস টাস পড়। বলতো, যে লোকটা আমাকে ফোনে ইনফর্ম করল সে কে হতে পারে?
- আমাকে একটু ভাবতে দাও। উ ম ম — এই মুহূর্তে তিনটা সম্ভবনার কথা বলতে পারি। প্রথমত, লোকটা বেনিফিশিয়ারী পক্ষের কেউ, অর্থাৎ যে কিডনিটা রিসিভ করছে তার কোন আত্নীয় স্বজন হতে পারে।
- কিন্তু বেনিফিশিয়ারী পক্ষের ইনফর্মেশন লিক করে কি লাভ? প্রশ্ন করে ফয়সাল।
- কোন লাভ নাই। স্রেফ আত্ম দহন, অনুশোচনা যাই বল এধরণের একটা কিছু। সেকেন্ড পসিবিলিটি, লোকটি মেডিয়েটরদের কেউ। খুব সম্ভবত কিডনিটা ব্ল্যাক মার্কেটে চলে গেছে। পরে টাকা পয়সা লেনদেন ঠিকমত হয় নাই পার্টির সাথে। তাই হয়ত ———
- আর তৃতীয় সম্ভাবনা?
- তোমার ঐ নিরাময় ক্লিনিকের কোন কর্মকর্তা বা ডাক্তার ফাক্তার হতে পারে।
নূরজাহানের বিচার বিশ্লেষনে যারপর নাই বিস্মিত হয় ফয়সাল। মেয়েলোকের মাথায় নাকি বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই কম। যেটুকুও বা আছে তা অত্যাধিক স্থূল। এধরণের অপপ্রচার যারা বাজারে চালু করে তাদেরকে ধরে এনে জর্জ বুশীয় কায়দায় শায়েস্তা করা দরকার- মনে মনে ভাবে সে। নূরজাহান তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে রহস্যের আংশিক কিনারা করে প্রমাণ করল যে মেয়েলোকের বুদ্ধি মোটেই স্থূল নয়, বরং অতি সূক্ষ্ম। আর বুদ্ধির পরিমাণ কমতো নাই, ক্ষেত্র বিশেষ বেশী- অন্ততঃ তার মত উজবুক আম সাংবাদিকের চাইতে কয়েকগুণ বেশী।

॥পাঁচ॥

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ফয়সালের দুঃস্বপ্ন দেখে। লাশ কাটা ঘরে একলা দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনে লীন সেই মৃত দেহ। মৃত দেহটি একসময় শোয়া থেকে উঠে বসে। ভয়ে কাঠ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ফয়সাল। মৃতা মহিলা কোন কথা বলে না। শুধুই তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে চাদরের তলা থেকে রক্ত শুন্য ফ্যাকাশে হাত বের করে ফয়সালের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মৃতার হাতে মানুষের দেহের কোন খুচরা যন্ত্রাংশ- সম্ভবত কিডনি। কানে কানে ফিসফিস করে কেউ বলে -পালাও, ফয়সাল পালাও, বাঁচতে হলে পালাও। ঘুরে দৌঁড়াতে শুরু করে সে। পেছন পেছন ছুটে আসে মৃতা মহিলাটি, সারা দেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা, হাতে কিডনি। একপর্যায়ে প্রায় ধরে ফেলে মৃত দেহটি তাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরীর ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাকি রাতটা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দেয় সে। সকাল বেলা গোসল সেরে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়ে। গলির মোড়ের ফার্মেসীতে এসে নিরাময় ক্লিনিকে ফোন করে, উদ্দেশ্য আতাহার নামের ভদ্রলোকটির খোঁজ নেওয়া। অন্য প্রান্তে সুরেলা নারী কণ্ঠ ভেসে আসে- হ্যালো, গুড মর্নিং, নিরাময় ক্লিনিক। সম্ভবত গতকালের সেই নখ পরিচর্যা কারিনী।
- গুড মর্নিং, আমি কি আতাহার সাহেবের সাথে কথা বলতে পারি?
- সিওর, হোলড অন এ মিনিট প্লীজ। অন্যপ্রান্তে পিয়ানোর টুং টাং মিউজিক বাজতে থাকে কিছুক্ষণ। মিনিট খানেক পরে কেউ একজন ফোন ওঠায়- হ্যালো, সাম কুম, আতাহার বলছি।
বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটা শব্দ হয় ফয়সালের- ধক ধক, ধক ধক। কেন্দ্রিয় স্নায়ু তন্ত্র সেই হাতুড়ি পেটা শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার করে ফেলে পরমুহূর্তে। প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ দেয় না সে।
- হ্যালো আতাহার সাহেব, আমি জানি আপনিই সেই ব্যক্তি যে গত কাল দৈনিক জনপদ অফিসে ফোন করেছিলেন। আতাহার সাহেব আপনি দয়া করে ফোনটা নামিয়ে রাখবেন না। আপনার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।
অন্য প্রান্ত থেকে আতাহার নামের ভদ্রলোক কোন রা করে না।
- হ্যালো, আতাহার সাহেব, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? তাগিদ দেয় ফয়সাল।
- হ্যা, বলেন শুনছি। আতাহারের কণ্ঠে স্পষ্ট ভীতির ছাপ।
- আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া খুবই জরুরী। এক কাজ করেন- এখন তো বাজে নয়টা।

সাড়ে দশটার মধ্যে আপনে আমাকে মীট করেন, বেইলী রোডে মহিলা সমিতির মেইন গেটে। আমি পরা থাকব ঘিয়া রঙ্গের ফুল হাতা শার্ট, কালো প্যান্ট, কাঁধে ঝোলানো একটা ক্যামেরাও থাকবে। ঠিক আছে আতাহার সাহেব?

- ঠিক আছে।

অন্য প্রান্তে ফোন রাখার শব্দ হয়। ফয়সালও ফোন নামিয়ে রেখে, ফার্মেসী ওয়ালার পাওনা মিটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।

মহিলা সমিতির গেটের ভেতরে প্রাচীরে ঠেস দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। বয়স বছর পঁচিশেক, পরনে গ্রামীন চেকের হাফ হাতা শার্ট, খাকি প্যান্ট, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। যুবকটি কিছুক্ষণ পরপর বিরক্তি ভরে একবার হাত ঘড়ির দিকে আরেকবার মেইন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। পৌণে এগার বেজে গেছে। যুবকটি ফিরে যাবার জন্য রাস্তার দিকে পা বাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় গেটে একটা রিক্সা এসে থামে। রিক্সার যাত্রীর পরনে ঘিয়া রঙ্গের ফুল হাতা শার্ট, কালো প্যান্ট, কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা- টেলিফোনে পাওয়া বর্ণনার সাথে হুবহু মিল। যুবকটি এগিয়ে যায় রিক্সা থেকে নামা আগন্তুকের দিকে।

- সাম কুম, আমি আতাহার।

- আমি ফয়সাল, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক জনপদ।

করমর্দন করে দু'জনে। আতাহার নামের যুবকটি ফয়সালের করমর্দন রত হাত ধরে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আতাহারের পেছনে পেছনে মহিলা সমিতির প্রধান ফটক পেরিয়ে বারান্দায় চলে আসে সে। সকাল বলে টিকেট কাউন্টার বা বারান্দায় কোন লোকজন নেই। মেইন রাস্তা আড়াল করে, কোনার দিকে বারান্দার মেঝেতে দু'জন পাশাপাশি বসে।

- আতাহার সাহেব আপনি কি কোন কারণে নার্ভাস বা কাউকে ভয় পাচ্ছেন? প্রশ্ন করে ফয়সাল। আতাহার বসা অবস্থা থেকে অর্ধেকটা উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছে। তারপর পূর্বাবস্থায় বসতে বসতে বলে

- আপনি আমার খোঁজ পেলেন কিভাবে?

- আপনার কৌতুহল যথাসময়ে মেটানো হবে আতাহার সাহেব। কিন্তু তার আগে সবকিছু আমাকে খুলে বলেন প্লীজ। আতাহারের নার্ভাসনেস ভাবটা ইতমধ্যে অনেকটা কমে এসেছে। ঢোক গিলে বলতে শুরু করে সে

- তেইশে জুন, দিনটা সোমবার। বিকেলে ডিউটি ছিল আমার। কেবিনগুলোতে টহল দিয়ে কেবল আফিস রুমে বসেছি, এমন সময় ইন্টারকমে ডিরেক্টরের কল আসে।

- কে ডাক্তার চৌধুরী?

- হ্যা। উনার অফিসে গিয়ে দেখা করতেই বলেন যে এখনি তার সঙ্গে ওটিতে যেতে হবে। একটা সার্জারী আছে, কিডনি রিমুভাল। কিডনি অপসারনের ব্যাপারটা আমি থিওরেটিকালি জানতাম, কিন্তু বাস্তবে কখনও করা হয়ে ওঠেনি। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায় আমি ভেতরে ভেতরে বেশ পুলকিত হই। রোগীর নাম বা কে কিডনিটা নিচ্ছে এধরণের কোন অনুসন্ধিৎসা সেই মুহূর্তে আমার জেগে ওঠেনি। তৈরী হয়ে আমি আর ডঃ চৌধুরী যখন ওটিতে আসি তখনও রোগীর মানে রোগিণীর পালস, প্রেসার এগুলো মেজার করা হচ্ছিল। আমরা যাবার পর পরই পেসেন্টকে অজ্ঞান করা হয়। অপারেশনটা মূলত করেন ডঃ চৌধুরী, আমি মাঝে মাঝে হাত লাগাই। গত মাসের একুশ তারিখে আমার একটা বাচ্চা হয়েছে- ছেলে। নাম রেখেছি সাদ্দাম হোসেন। ছেলেটাকে দেখার জন্য মনটা কেমন যেন করছিল। অপারেশন শেষ হবার পরই আমি ডঃ চৌধুরীকে বলে বাসায় চলে আসি।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামে আতাহার।

- তারপর? প্রশ্ন করে ফয়সাল।

- পরদিন ক্লিনিকে এসে মহিলাকে দেখিনি। স্বভাবতই কিউরিওসিটি জাগে। আমাদের সঙ্গে সার্জারীর সময় দু'জন নার্স ছিল। ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করায় সে জানায় যে- পেসেন্টকে পিজিতে ট্রানসফার করা হয়েছে। ব্যস আমার কৌতূহল নিবৃত হয়ে যায়। ভুলেই গেছিলাম মহিলার কথা। আমার আবার পত্রিকা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ার বদঅভ্যাস আছে। যাইহোক সেদিন নিউ মার্কেটের ফার্স্ট গেটের নিউজপেপার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আপনাদের পত্রিকাটায় চোখ

বুলাচ্ছিলাম। তখন ছবিসহ সংবাদটা নজরে পড়ল। দু'দিন খুব ভাবলাম। Shall I go to the police, or contact you guys? একদিকে তীব্র আত্মদহন, অন্যদিকে ভয়। ফাইনালি সিদ্ধান্ত নিলাম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার।

- আত্মদহনের ব্যাপারটা বুঝলাম, কিন্তু ভয়ের ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার না আমার কাছে। কাকে ভয় পাচ্ছেন আপনি? পার্টিকুলার কোন ব্যক্তি?

- আমি ঠিক জানিনা কাকে ভয় পাচ্ছি। পত্রিকায় সংবাদটা ছাপার পর কয়েকটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। আমাদের ডিরেক্টর, চৌধুরী সাহেব হঠাৎ বিদেশে চলে গেলেন। তারপর যে দু'জন নার্স আমাদের সঙ্গে ছিল তারা ছুটিতে চলে গেল। ঐ দিন ওদের দু'জনেরই ওভার নাইট ডিউটি ছিল। অর্থাৎ রোগী যখন মারা যায় তখন তারা ক্লিনিকে প্রেজেন্ট ছিল। আমার ধারণা নার্স দু'জন হয়ত আর কাজে জয়েন করবে না। অবশ্য আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

- আতাহার সাহেব আমার মনে হয় আপনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু আসল সত্য যদি বের হয়েই যায়, তখন আপনিও সাম হাউ লাইম লাইটে এসে যাবেন, তাই না? এটা বোঝার পরও আপনি পত্রিকায় যোগাযোগ করেছেন আবার সেই সাথে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। কেন?

- অনেস্টলি বলছি আমি জানিনা। আসলে আমি একটা হিপোক্র্যাট। এক দিকে নিজের চাকুরী, ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়া আর সেই সাথে নিজের প্রাণের মায়াটা করছি। আবার অন্য দিকে অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে চাইছি।

- এ নিয়ে নিজেকে ছোট ভাবার কারণ নেই আতাহার সাহেব। আমরা কম বেশী সবাই হিপোক্র্যাট।

আতাহারের কাঁধে সান্ত্বনা সূচক চাপড় দেয় ফয়সাল। তারপর গতদিনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

- আপনি কি নিশ্চিত যে পত্রিকায় ছাপা সেই ছবি আর ওটির সেই রোগী একই ব্যক্তি।

প্রশ্নটা করার সময় বুক পকেটে সযতনে খামের ভেতর রাখা মৃতা মহিলার ছবি আতাহারের সামনে তুলে ধরে ফয়সাল। মিনিট খানেক ছবিটা উলটিয়ে পালটিয়ে, কাছে দুরে নিয়ে পরখ করে উত্তর দেয় আতাহার- হ্যা আমি নিশ্চিত।

- হাউ কুড ইউ বি সো ড্যাফিনিট?

- ওয়েল, মহিলার চোখ। কিছু একটা ছিল উনার চোখে। সহজে ভোলার না।

- আর কিছু? এমন কিছু কি মনে পড়ে যা দিয়ে আমরা ভদ্রমহিলার পরিচয় খুঁজে পেতে পারি?

- জ্ঞান হারানোর আগ মুহূর্তে মহিলা একটা কথা বার দুই উচ্চারণ করেছিল। কোন একটা জায়গার নাম। খুব সম্ভবত বলছিল *আমি সলিমাবাদ যামু*।

- কথায় কোন আঞ্চলিক টান ছিল?

- আমি ভাষা শুনে ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারিনা। আই এ্যাম নট দ্যাট স্মার্ট । তবে মমেনসিং মমেনসিং টান ছিল বলে যতদূর মনে পড়ে। আই উইশ আই রিকলড দ্যাট রাইট।

- আতাহার সাহেব আপনি জানেন না যে কতটা ভাইটাল ইনফর্মেশন আমাকে দিলেন। আপনি কোন দিকে যাবেন এখন- ক্লিনিকে নাকি বাসায়? চলেন এগিয়ে দেই।

- ইটস অল রাইট। আমি আসলে এখন রাস্তায় একা একা কিছুক্ষণ হাটব। আপনি চলে যান।

- ও কে। ভাল থাকবেন আতাহার সাহেব, আর একটু সাবধানে । ঠিক আছে? আমি যথাসময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করে বিদায় নেয় ফয়সাল।

মহিলা সমিতি থেকে বেরিয়ে বাশার সাহেবের বাসার দিকে রওয়ানা করে সে। বাশার সাহেব থাকেন সলিমুল্লাহ রোডে। কলিং বেল টিপতে দরজা খোলে স্বয়ং খায়রুল বাশার- পরনে লুঙ্গি, হাতে চটের ব্যাগ। পলিথিন ব্যাগ ঢাকা শহরে নিষিদ্ধ হবার পর থেকে এই জিনিসটা আবার নাগরিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

- বাজারে যাচ্ছিলেন বাশার ভাই?

- হ্যা। কি ব্যাপার সকাল সকাল? কোন নিউজ আছে নাকি? আস ভেতরে আস।

ফয়সাল এ বাড়িতে আগে বহুবার এসেছে। তাই সে নিঃসঙ্কোচে বাশার সাহেবের পেছন পেছন বসার ঘরের দিকে যায়। বসার ঘর বলতে বাশার সাহেবের নিজস্ব স্টাডি রুম। ঘরটা অগোছালো।

কার্পেট বেছানো মেঝতে এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো বই পুস্তক, পেপার ম্যাগাজিন। কোনায় একটা ছোট্ট টেবিল, টেবিলের ওপরও গাদা মারা বই।
- এত বই পড়ার সময় হয় কি করে বাশার ভাই?
কার্পেটের এক কোনা থেকে বই পুস্তক সরিয়ে বসার জায়গা করে নিয়েছে ইতিমধ্যে ফয়সাল।
- পড়া কি আর হয়। পড়ার ভাব ধরা আরকি, বুঝলা না। তা বল, পর সমাচার বল।
গতকালের ক্লিনিকের ঘটনা থেকে শুরু করে কিছুক্ষন আগে আতাহারের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত সব বিস্তারিত খুলে বলে ফয়সাল। সব শুনে গুম মেরে বসে থাকে বাশার সাহেব কিছুক্ষণ।
- হুম, ব্যাপারটা রহস্যজনক।
- আমার মনে হয় এখন ক্লিনিকে গিয়ে কিডনি রিসিভারের খোঁজটা নেওয়া উচিত।
- লাভ নাই কোন। তোমার ঐ মেহেরুন্নেসার মতই কাউকে হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে ডেডবডির পরিচয় মিলবে কিনা সন্দেহ। কি নাম বললা জায়গাটার?
- সলিমাবাদ।
- আমার এক খালু আছেন। ডাক বিভাগে কাজ করতেন। বাংলাদেশের প্রতিটা অঞ্চল উনার নখদর্পণে। তুমি একটু বস, দেখি আমি উনাকে পাই কিনা। ফয়সালকে বসিয়ে রেখে অন্দর মহলে চলে যায় বাশার সাহেব। ফেরে পাঁচ মিনিট পর, হাতে দুই কাপ ধুমায়িত কফি। এক কাপ ফয়সালের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আগের জায়গায় বসে পড়ে সে।
- পাওয়া গেছে। সলিমাবাদ গ্রামটা টাঙ্গাইলে, থানা নাগরপুর। বছর পাঁচেক আগে উনি একবার ঐ এলাকায় মানে নাগরপুরে গেছিলেন। নাগরপুরের চৌধুরী বাড়ি নাকি দেখার মত একটা পুরাকির্তী। আরেকটা সলিমাবাদ গ্রাম আছে ঈশ্বরদীতে। কিন্তু যেহেতু তুমি বলছ কথায় ময়মনসিংহের টান ছিল, সেহেতু প্রথমটা হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। তো ফয়সাল সাহেব, যাবে নাকি? দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঢাকা হইতে টাঙ্গাইল যাইয়া—-
- যাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে যাব? রুটটা কি?
- খুব সোজা। মহাখালী বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ে, ঢাকা টু এলাসিন। এলাসিনের ডাইরেক্ট বাস না পেলেও টাঙ্গাইল টাউন থেকে পাওয়া যাবে। এলাসিনে একটা নদী আছে, পুরানো ব্রম্মপুত্র। গুদারায় নদী পার হওয়ার পর টেম্পুতে করে নাগরপুর প্রোপার। নাগরপুর প্রোপার থেকে রিক্সা বা পায়ে হেঁটে সলিমাবাদ, মাইল তিনেক পথ। এখন যদি রওয়ানা কর সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আবার টাঙ্গাইল টাউনে ফেরত আসতে পারবা। দিন বড় আছে। একবার টাঙ্গাইল টাউনে আসতে পারলে ঢাকা শহরে আসাটা ওয়ান টু'র ব্যাপার।
টুনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে কথা দিয়ে এসেছে ফয়সাল। কিছুক্ষণ ভাবে সে। তারপর দৃপ্ত প্রত্যয়ের সাথে বলে- আমি যাব বাশার ভাই। কিন্তু আপনি কাইন্ডলি অফিস থেকে কাউকে দিয়ে নূরীকে একটা মেসেজ পাঠাবেন। জাস্ট ইনকেইস, যদি রাতের মধ্যে ফিরতে না পারি।
- ওকে আই উইল ডু দ্যাট। তোমার পকেটে টাকা আছে?
- না।
- আচ্ছা ঠিক আছে এইটা রাখ।
মানিব্যাগ থেকে পাঁচশ টাকার একট নোট বের করে ফয়সালের হাতে গুঁজে দেয় খায়রুল বাশার। বাশার সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা মহাখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ফয়সাল।

॥ছয়॥

সন্ধ্যা নাগাদ টাঙ্গাইল শহরে ফিরে আসার পরিকল্পনা থাকলেও, নাগরপুর পর্যন্ত যেতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। এত দেরী হবার কথা অবশ্য ছিল না। মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে এসে ফয়সাল জানতে পারে যে ইদানিং ঢাকা থেকে বি আর টি সি বাস ডাইরেক্ট নাগরপুর পর্যন্ত যায়। আর রাস্তা ভাল হওয়ায় সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা। মনে মনে বেশ খুশিই হয় সে। টিকেট কেটে উঠে পড়ে ফয়সাল। বাসও ছাড়ে সময় মত। সারা রাস্তায় কোন জ্যাম নেই। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল টাউন পর্যন্ত আসতে দু'ঘন্টার বেশী লাগেনা। কিন্তু বিপত্তি বাধে টাঙ্গাইল টাউন থেকে এলাসিনে যেতে। এই রুটেরই এক বাসে চাঁপা পড়ে জনৈক কলেজ ছাত্র নিহত হওয়ায় ছাত্ররা রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে রেখেছে। টাঙ্গাইল টু এলাসিন সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ। পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত। স্বয়ং ডিসি

সাহেব গেছেন রফা করতে। রফা করতে করতে পাঁচটা বেজে যায়। এলাসিন ঘাটে এসে নতুন করে বিপত্তি বাঁধে। কারণ ফেরীতে যান্ত্রিক ত্রুটি। অন্যান্য যাত্রীর সাথে সেও নেমে পড়ে। নৌকায় নদী পার হয়ে টু স্ট্রোক বেবিতে চড়ে যখন নাগরপুর থানা শহরে হাজির হল ফয়সাল, তখন সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম দিগন্ত টকটকে লাল। বেবি থেকে নেমে নতুন করে বিপত্তিতে পড়ে ফয়সাল। বিপত্তিটা রিক্সা ঘটিত। নাগরপুর থেকে সলিমাবাদের দূরত্ব মাইল তিনেকের বেশী হবে না। রাস্তার কন্ডিশন- সিকিটা পাকা, সিকিটা ইট বেছানো, আর বাকিটা মাটির। বর্ষা মরশুমে মাটির রাস্তায় কাঁদা পাকলার কারণে রিক্সা বা মোটর গাড়ি চালানো অসুবিধা হয়। কিন্তু বর্ষা এখনও শুরু হয় নাই। কাজেই রিক্সা সলিমাবাদ পর্যন্ত যেতে কোন অসুবিধা নেই। রিক্সাচালকদের মূল অভিযোগ রাস্তা নিয়ে না- নিরাপত্তা নিয়ে। নাগরপুর বাজার থেকে একটা পাঁকা রাস্তা সটান চলে গেছে ধুবুরিয়া হয়ে ঘিওরের দিকে। বাজার থেকে সেই পাঁকা রাস্তা ধরে সিকি মাইল গেলে ডান দিকে একটা ইট বেছানো রাস্তা চলে গেছে সলিমাবাদের দিকে। ইট বেছানো রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে রাস্তার দুই ধারে মূলত কোন বাড়ি ঘর নেই। আরো কিছুদুর এগোলে পরে একটা মরা নদী, নদীর নাম *নোয়াই গাং।* নোয়াই গাং পেরোলে আসে স্মশান ঘাট, স্মশান ঘাট শেষ হতে না হতেই কবরস্থান। এতটা বিরাণ ভূমি থাকলেও এলাকায় ভূতের উপদ্রব কোন কালেই ছিল না, ডাকাতিও হতো কালে ভদ্রে। কিন্তু ইদানিং ডাকাতির মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। তিন চার জন রিক্সাচালক ভাগে যোগে মিনিট দশ ধরে এসব তথ্য ফয়সালের গোচরে আনে। এবং সবশেষে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সলিমাবাদ ক্ষ্যাপে যাওয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে। দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায় ফয়সাল। রিস্ক নিয়ে পায়ে হেঁটে হয়ত সলিমাবাদ পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এক অজ পাড়াগাঁয়ে তার মত আনজান ব্যক্তিকে কোন সহৃদ গৃহকর্তাই বা এত রাতে আশ্রয় দিতে যাবে? পক্ষান্তরে নাগরপুর হচ্ছে একটা থানা শহর। খোঁজ খবর করলে নিশ্চয়ই কোন হোটেল বা বোর্ডিং- নিদেন পক্ষে চিৎকাইত বোর্ডিং মিলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্তহীনতার পাঁকে ঘুরপাক খেতে থাকে সে।

- ও মাস্টর সাব, এই হানে আহেন, আপনাগ গেরামের একজন ম্যাজবান আছে।

ফয়সালের সঙ্গে আলাপরত রিক্সাচালকদের মধ্যে একজন চা স্টলে বসা জনৈক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে চেচিয়ে ওঠে। রিক্সা স্ট্যান্ডের খানিকটা দূরে রাস্তার উলটো দিকে ঝুপড়ির মত চা স্টলে বসে ত্রিশোর্ধ এক ভদ্রলোক সুডুৎ সুডুৎ শব্দ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। রিক্সাচালকের ডাক শুনে, চায়ের কাপ বাঁশের বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসে মাস্টর পদবীর লোকটি। লোকটিকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে ফয়সাল। ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাতা শার্ট। শার্টটা একসময় লাল বা নীল এই জাতীয় কোন রঙ্গের ছিল, কিন্তু বহু ব্যবহার আর বারংবার ধৌত কার্যের ফলে আসল রংটি আর বোঝার উপায় নেই। মাথার চুলগুলি কাঁচায় পাকায় মেশানো, চিরুনীর আঁচড় পড়েনি বহুদিন, খোঁচা খোঁচা শ্মশ্রুমন্ডিত মুখমন্ডলে সরলতার ছাপ স্পষ্ট। লোকটি এগিয়ে এসে রিক্সাচালকের উদ্দেশ্যে বলে- কি সমাচার রজ্জব আলি? ডাকছ ক্যান?

রজ্জব আলি তর্জনি ইশারায় ফয়সালকে দেখিয়ে বলে- ইনি সলিমাবাদ যাইব। এই পরথম, আগে কুনদিন যায় নাই।

মাস্টার সাহেব এবার রজ্জব আলির দিক থেকে সরিয়ে ফয়সালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করে - মহাশয় সলিমাবাদ কোন বাড়িতে গমন করবেন?

আমতা আমতা করে উত্তর দেয় ফয়সাল- আসলে কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। চলেন না ঐ চা স্টলে বসে ব্যাপারটা খুলে বলি।

- বসার দরকার নাই। রাত অধিক হলে রিস্কটাও অধিক। তারচেয়ে বরং রওয়ানা দেওয়াই উত্তম। যাত্রা পথে সব শ্রবণ করা যাবে। সাইকেলে আরোহণ করে যেতে হবে, পারবেন তো?

চা স্টলের বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো দ্বীচক্রযানের দিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে মাস্টার।

- জিনিসটা মান্ধাতার আমলের হলেও চলে ভাল। ফনিক্স, মেইড ইন চায়না। পিছে না সামনে বসবেন?

- বসলেই হয় এক জায়গায়।

- তাহলে কষ্ট স্বীকার করে সামনেই বসেন, পেছনে বসলে আবার কাঁপাকাঁপি বেশি করে। সুবোধ

বালকের মত সাইকেলের রডের ওপর উঠে বসে ফয়সাল। মাস্টার মুনসিয়ানার সাথে সিটে চড়ে প্যাডেল মারা শুরু করে দেয়। চক্রাকারে ঘুরতে থাকে দ্বীচক্র, সামনের দিকে এগোয় দ্বীচক্রের আরোহী দু'জন। সমান বেগে পাল্লা দিয়ে বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকে রিক্সা স্ট্যান্ড, চা স্টল, দোকান পাট, খদ্দের, পসরা, গুঞ্জণ, কোলাহল। সাইকেলের মাড গার্ডের ওপর মোটর বাইকের অনুকরণে ডায়নামো চালিত হেডলাইট লাগানো আছে। এতক্ষণ জিনিসটা চোখে পড়েনি ফয়সালের। বাজার শেষ হবার পর, রাস্তার দুই ধারে দোকান পাট না থাকায় অন্ধকার নেমে এসেছে এতক্ষণে। মাস্টারের দ্বীচক্রযানের স্বল্প ক্ষমতার হেডলাইট এবারে পিচ ঢালা পথে আছড়ে পড়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ নেচে নেচে ওঠা সেই আলোটুকু ম্যাগনাকার্টারের ভূমিকা নেয়। সমুদ্র বক্ষে পাল তোলা জাহাজের কাপ্তেনের মত ম্যাগনাকার্টারের দিক নির্দেশনায় সুনিপূণতার সাথে আগের গতিতেই প্যাডেল মেরে যায় মাস্টার। খানিক যাওয়ার পর সাইকেলের হ্যান্ডেল ডান দিকে বাঁক নেয়। হেডলাইটের আলোও ঘুরে যায় নব্বই ডিগ্রী। মৃদু ঝাকি অনুভব করে ফয়সাল। পীচ ঢালা পথ ফুরিয়ে সম্ভবত ইট বেছানো রাস্তা শুরু হয়েছে।
- জনাব মনে হয় পশ্চাত দেশে আঘাত অনুভব করছেন। একটু সহ্য করেন, মাত্র সিকি মাইল ইট বেছানো। তারপরেই কাচা রাস্তা। দীর্ঘক্ষণ একনাগাড়ে প্যাডেল মারার পর কথা বলে মাস্টার।
- না না আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মাস্টার সাহেব আপনার নামটা যেন কি?
- অধমের নাম সাইফুল ইসলাম। সলিমাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। জনাবের নাম, পরিচয়?
- ফয়সাল আহাম্মেদ। দৈনিক জনপদ পত্রিকার সাথে যুক্ত।
- বলেন কি সাংবাদিক। সাংবাদিক আসার মত কোন ঘটনা সলিমাবাদ গ্রামে নিকটবর্তী অতীতে ঘটেছে বলে তো আমার স্মরণে আসে না।
- আমি এসেছি এক বেওয়ারিশ লাশের পরিচয় খুঁজতে। সলিমাবাদ গ্রামের এমন কেউ কি আছে যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
- নাহ। এরকম কিছু হয়ে থাকলে আমি অবগত থাকতাম। স্ত্রী লোক নাকি পুরুষ?
- মহিলা।
- বেওয়ারিশ যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই নাম জানেন না। ছবি আছে সাথে?
- হ্যা আছে।
মাস্টার দ্রুত প্যাডেল মারে। স্মশান আর কবরস্থান পেরোনোর পর একটা বাজারের সামনে এসে সাইকেলের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়। বাজার বলতে গোটা দশেক ঝুপড়ির মত দোকান যার বেশির ভাগই সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারের শেষ মাথায় ছোট একটা চায়ের দোকান এখনও খোলা। তবে চা স্টলে কোন খদ্দের নেই। দোকানের সামনে সাইকেলের ব্রেক কষে মাস্টার।
- এই গ্রামটার নাম কি? প্রশ্ন করে ফয়সাল।
- 'বেকড়া'। আসেন এক কাপ চা পান করি।
মাস্টারের সাথে সাথে স্টলের সামনের বাঁশের বেঞ্চিতে এসে বসে ফয়সাল।
ধূমায়িত চায়ের কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে ফয়সালের উদ্দেশ্যে বলে মাস্টার- কই জনাব ছবিটা বের করেন তো, আমি কৌতূহল দমন করতে পারছি না।
বুক পকেট থেকে ছবিটা বের করে স্বল্প ক্ষমতার বৈদ্যুতিক বালবের মৃদু আলোয় মেলে ধরে ফয়সাল। ছবিটার দিকে তাকিয়েই ভুত দেখার মত চমকে ওঠে মাস্টার।
- অসম্ভব, এ্যাবসার্ড।
- চেনেন নাকি?
- হ্যা চিনি, খোরা পাগলনি। মাস্টারের কণ্ঠ আঁর্দ্র, কাঁপা কাঁপা।
- আর ইউ অলরাইট মাস্টার সাহেব?
- না রে ভাই সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক নাই। বাকী পথটা আপনাকে হন্টন করেই যেতে হবে, সাইকেল চালানোর মত অবস্থা আমার নাই।
- মাস্টার সাহেব আপনি মনে হচ্ছে ছবিটা দেখে খুব শকড হয়েছেন। মহিলার নাম যেন কি বললেন? আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ?

- আসল নাম আমি জানিনা। এই গ্রামে আসার পর থেকেই দেখছি। জটা ধরা কেশ, ছিন্ন বসন, চোখে পিচুটি, হাতে একটা মাটির খোরা। মস্তিষ্কে গন্ডগোল। ছোট বড় সবাই বলত খোরা পাগলনি। পাগলনির আদি নিবাস, পিতা মাতা, আসল নাম কেউ জানেনা। হাতে খোরা নিয়ে গ্রামের এমাথা থেকে ওমাথা দিন ভর হেঁটে বেড়াত। ক্ষুধা পেলে, সামনে যে দুয়ার পড়ত সে দুয়ারেই দাঁড়িয়ে যেত। মুখে কিছু বলত না। ধনী, গরীব, ক্ষেতমজুর সে যেই হোক খোরা পাগলনির মনের কথা বুঝতে পারত। নিরাশ করত না কেউ। পাগলরা সাধারণত মারমুখী- ভায়োলেন্ট হয়। খোরা পাগলনি সেরকম ছিল না। দুষ্টু বালক বালিকারা মাঝে মাঝে ইট পাটকেল ছুড়ত, খোঁচা খাচি দিত। কিন্তু খোরা পাগলনি ভুলেও পালটা ঢিল ছুড়ত না। বেশী বিরক্ত হলে মাটিতে বসে পড়ে কপাল চাপড়ে ক্রন্দন জুড়ে দিত আর বলত- *খান্নাছ*, তোরা সব *খান্নাছ*। *কুল আউজুবে রাব্বিন্নাছ, মিনশাররেল ওয়াসওয়াসিল খান্নাছ, ইছু বিছু দুরিন্নাছ, ইছু বিছু দুরিন্নাছ, খান্নাছ।* সুরা নাছ এইভাবে এলোমেলো কয়েকবার পড়ে আবার উঠে হাঁটা শুরু করত। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। দশ দিন পনের দিন, এক মাস কোন খোঁজ খবর নেই। আবার হঠাৎ একদিন এসে হাজির।
- রাতে থাকত কোথায়?
- সধারণত দেওয়ান মঞ্জিলে। দেওয়ান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের দেওয়ান, নাম সম্পর্কে অবগত আছেন নিশ্চয়ই।
- ইসমাঈল দেওয়ান? গত সাধারণ নির্বাচনে যে বিএনপি, আওয়ামী লীগ দুই দল থেকেই নমিনেশনের ––
- আপনি ঠিকই ধরেছেন জনাব। দেওয়ান সাহেবের বাড়ি সলিমাবাদ গ্রামে। বালিকা বিদ্যালয়ের খুব নিকটেই উনার বিশাল বসত বাটি। বাড়িতে বর্তমানে কেউ নাই। লোকমান নামের একজন আছে। তার কাজ শুধু বাড়ি ঘর পাহারা দিয়ে রাখা। আগে উনারা ঈদ পরবে আসতেন জাকাত ফেতরা বন্টন করার জন্য। তবে বর্তমানে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত করছেন। আগামী নির্বাচনে টিকেটটা নিশ্চিত করতে চাইছেন আরকি। তবে লোক খুব ভাল। বহু দাতব্য করেছেন বিগত কয়েক বছরে।
- মাস্টার সাহেব আমরা কি রাতেই একবার দেওয়ান মঞ্জিলে যেতে পারব?
- নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমার গৃহে যাবার পথেই দেওয়ান মঞ্জিল। রাত তেমন হয় নাই, লোকমান হয়ত জাগ্রতই আছে।

সলিমাবাদ গ্রামটা অন্য দশটা গ্রামের মত জীর্ণ দশার না। গ্রামের সীমানা শুরু হবার পর থেকে রাস্তার দুই পাশে একটাও ছনের ঘর চোখে পড়েনি ফয়সালের। বেশীর ভাগ ঘরের ভিটা ইট সিমেন্ট দিয়ে পাঁকা করা, টিনের বেড়া আর দোচালা কি চার চালা টিনের ছাউনি- বিজলি বাতির আলোয় ঝকঝক করছে। এরকমই একটা ঝকঝকে তকতকে বাড়ির সামনে এসে সাইকেলের ঘন্টা বাজায় সাইফুল মাস্টার। বাড়িটির চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের উপরিভাগে শহুরে কায়দায় কাঁচের টুকরা আর তারকাটার আস্তর দেয়া। বিশাল প্রবেশ দার লৌহ নির্মিত। বন্ধ দারের সামনে দাঁড়িয়ে হাক ছাড়ে মাস্টার- লোকমান বাড়ি আছো নাকি, লোকমান?
ভেতর থেকে জওয়াব আসে- ডাকে ক্যারা , এত রাইতে?
- আমি সাইফুল মাস্টার। দরজা খোল, দরকার আছে।
মিনিট খানেক পর ক্যাচর ক্যাচর শব্দ করে ফটক খোলে লোকমান।
- সালামালাইকুম। এত রাইতে আফনে মাস্টর সাব? খবর পাঠাইলেই তো যাইতাম।
বোঝা যায় মাস্টারকে যথেষ্ট সম্মান করে লোকটি।
- খবর পাঠানোর মত মনমানসিকতা নাই। চল ভেতরে চল কথা আছে।

দেওয়ান মঞ্জিলের আয়তন বিশাল। মূল ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ইট বেছানো চওড়া পথ, দুই ধারে যত্ন করে ছাটা ঝাউ গাছের সারি, পথের শেষে দোতলা দালানের গাড়ি বারান্দা। মূল দালানে না প্রবেশ করে গাড়ী বারান্দা পাশ কাটিয়ে ডানে মোড় নেয় লোকমান, পেছনে সাইফুল মাস্টার আর ফয়সাল। দ্বীতল ভবনের পাশে ছোট দোচালা টিনের ঘরের সামনে এসে জোর গলায় ডাক দেয় লোকমান- ফুলবানু- - ও ফুলি দুই কাপ চা বানা মাস্টর সাব আইছে।
- তুমি ব্যস্ত হইও না লোকমান, আমরা বসুম না।

- তাই কি অয় মাস্টর সাব, ম্যাজবান নিয়া আইছেন। ইনারে তো চিনবার পারলাম না।
- ইনারে তুমি চিনবা না। ঢাকা থিকা আইছেন, সাংবাদিক।
- বসেন মাস্টর সাব বসেন। সংবাদিক সাব বসেন। বারান্দায় পাতা জল চৌকি কাঁধের গামছা দিয়ে খানিক ঝেড়ে অতিথিদের বসার অনুরোধ জানায় লোকমান। ইশারায় ফয়সালকে বসতে বলে নিজেও চৌকির এক প্রান্তে বসে পড়ে মাস্টার।
- পাগলির কোন খোঁজ জানো নাকি লোকমান?
- না মাস্টর সাব, আইজ মেলা দিন অইল খোরা পাগলনির কুনো খোঁজ নাই।
কপাল থেকে আধা হাত দূরত্ব পরিমান ঘোমটা টেনে এক জেনানা চুড়ীর রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে লোকমানের পেছনে এসে দাঁড়ায়। মহিলার বা হাতে ধরা একটা কাঁসার বাসন, বাসনের ওপর দুই কাপ ধুমায়িত চা, অন্য হাতে টিনের বাসন ভরা মুড়ি। ঘোমটার আড়াল থেকে মাস্টারকে সালাম জানায় মহিলা- ছালামালাইকুম, মাস্টর সাবের শইলডা কেমুন?
- আমি ভাল আছি। তুমি ভাল আছো? তোমার মেয়েটার মাঝে জ্বর জারি হইছিল। এখন ক্যামন আছে?
- জ্বে, আল্লার রহমতে আর আফনেগো দোয়ায় বালা আছে। নেন চা নেন, গরে কিছু নাই- দুগা মুড়ি ছিল--- আগে জানলে চাইরডা পিয়াজি ভাইজা রাখতাম।
অতিথিদ্বয়ের মাঝখানে জল চৌকির ওপর বাসন দুটো নামিয়ে রাখে ফুলি। মহিলার সাদা মাটা অথচ আন্তরিক আতিথেয়তায় যারপর নাই অভিভূত হয় ফয়সাল।
প্লেট থেকে এক মুঠ মুড়ি মুখগহব্বরে চালান দিয়ে ফয়সালকে উদ্দেশ্য করে বলে- খান জনাব, সঙ্কোচ করবেন না। হোক না সামান্য মুড়ি। ঢাকা শহরে এই আন্তরিকতাটুকু নিজের পরিবার পরিজনের কাছ থেকেও পাবেন না। হ্যা যা বলতে ছিলাম, পাগলিকে তোমরা সর্বশেষ কবে দেখেছ ফুলি?
- ঠিক ইয়াদ নাই। তয় বিশ পচিশ দিন তো অইবই। ক্যা কি অইছে পাগলির? ফুলি প্রশ্ন করে।
- পাগলি আর এই দুনিয়ায় নাই। কে যেন তারে ঢাকা শহরে নিয়ে খুন করছে। মাস্টার শেষ বাক্যটি বলার সাথে সাথে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। চারজনের কারো মুখে রা নেই। শুধু মচর মচর মুড়ি চিবানোর শব্দ। কাছে ধারে কোন বৃক্ষের শাখা থেকে হুতোম প্যাঁচা ডেকে ওঠে। মাঝ আকাশে বিজলি চমকায়। কয়েক সেকেন্ড পর গুডুম গুডুম মেঘ গর্জে ওঠে। মাস্টারের এলোমেলো চুলে হাওয়ার দমকা খেলা করে। বাসনের মুড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে জলচৌকি আর মাটিতে।
- মনে হয় বৃষ্টি হবে।
অমাবশ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার আকাশের পানে চেয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে মাস্টার।
- এমুন কাম কেডা করল। লোকমানের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়।
- সেইটা জানার জন্যই তো ইনি ঢাকা থিকা আসছেন। তোমরা মনে করে দেখো কিছু বলতে পারো কিনা।
- আমি বিশ বাইশ দিন আগে দৌলতপুর গেছিলাম। হৌর বাড়ি। ফুলির মায়ের শইলডা বেশি বালা যাইতেছে না। অসুইক্যা মাইয়া নিয়া ফুলি যাইবার পারল না। আমি একাই গেছিলাম। ইয়াদ অয় দৌলতপুর যাওয়ার আগে পাগলিরে দেইখা গেছি। আহনের পর আর দেখি নাই। ঐ ফুলি তুই কিছু কইবার পারসনি?

লোকমান কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে না পারলেও, ফুলির জবান থেকে বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। ফুলির ভাষ্য মতে, লোকমান যেদিন দৌলতপুর যায় সেদিন বিকালে হঠাৎ সাহেব অর্থাৎ ইসমাঈল দেওয়ান ঢাকা থেকে এসে হাজির। সাথে শুধু ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। অন্য সময় বাড়ি আসার সাথে সাথে দেওয়ান সাহেব গ্রামের খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেন। কিন্তু সেদিন আসার পরই সোজা দোতলা চলে যান। বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে সারাটা বিকাল আর সন্ধ্যা পার করে দেন। এর মধ্যে গ্রামের মাতব্বর গোছের দু'চার জন দেখা করতে দেওয়ান মঞ্জিলে হানা দিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ান সাহেব কারো সাথেই দেখা করেননি। ড্রাইভার ইদ্রিস আলিকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল যে *ছুডো আফার* মানে সাহেবের একমাত্র কন্যা ফারহানার শরীর খুবই খারাপ। বাঁচে কিনা সন্দেহ। আর তাই সাহেবের মনটা ভাল নেই। রাতে রান্না বান্না শেষ করে খাবার টেবিলে দিয়ে ফুলি দোতলায় যায়। দোতলায় গিয়ে সে

দেখতে পায় যে সাহেব পাগলির সাথে কি নিয়ে যেন কথা বলছেন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠ্যাকে তার কাছে। কারণ অতীতে কখনই সাহেবকে পাগলির সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি ফুলি।

সকাল বেলায় যখন নাস্তা বানানোর যোগাড় যন্তর করছিল ফুলি, তখন খালের ওপারের আনিসুল মুনসীর দ্বিতীয় পক্ষ এসে খবর দিল যে উত্তর পাড়ার আয়নাল ব্যাপারীর নয় দশ বছরের তাজা *ছাওয়ালডা* পুকুরে ডুবে মারা গেছে। ব্যাপারী বাড়ির পুকুরে মানুষ ডুবে মরার ঘটনা এই প্রথম না। সারা দুনিয়ার নদী নালা খাল বিল শুকিয়ে কাঠ হলেও ব্যাপারী বাড়ির পুকুর আজ পর্যন্ত শুকায় নাই। পুকুরের টালকা পানিতে বড় বড় গজার মাছ দিনে দুপুরে মাথা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আসলে ওগুলো গজার মাছ না, ওগুলো হচ্ছে *দ্যাও*। তাছাড়া পুকুরের পাড় ঘেষে বহু পুরানা এক তেতুল গাছ আছে। সেই গাছে *নিঃস্কাইন্দার* বসবাস। *নিঃস্কাইন্দা* হচ্ছে এমন এক শ্রেনীর ভুত যার শরীর আছে কিন্তু মাথা নাই। বুকের ওপর এক জোড়া চোখ অন্ধকারে চিতা বাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করে। একবার সেই চোখের দৃষ্টি কারো ওপর পড়লে আর রক্ষা নাই। এসবই অবশ্য ফুলির শোনা কথা। সে কখনও শ্যাওলা পড়া কালা কালা গজার মাছ প্রত্যক্ষ করেনি। আবার *নিঃস্কাইন্দার* জ্বলজ্বলে চোখের রোষানলেও পড়েনি। তবে ব্যাপারী বাড়ির *ছাওয়ালের* মৃত্যুটা যে নিছক দুর্ঘটনা নয়, দ্যাও বা *নিঃস্কাইন্দা* ঘটিত, সে ব্যাপারে মুনসীর দ্বিতীয় পক্ষের সাথে পুরোপুরি একমত পোষণ করে ফুলি। মৃত দেহ প্রত্যক্ষ করার কৌতূহলও তাই সে দমন করতে পারেনা। মেয়েকে কোলে নিয়ে মুনসীর বৌর সাথে সেও উত্তর পাড়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। যাবার আগে পাগলিকে পই পই করে অনুরোধ করে যায় যাতে সে রান্না ঘর ছেড়ে একচুলও না নড়ে।

উত্তর পাড়া থেকে লাশ দেখে ফিরে আসতে বেশিক্ষণ লাগেনি তার– আধা ঘন্টা, বড় জোর একঘন্টা। বাড়ি ফিরে এসে দেখে গাড়ি বারান্দায় সাহেবের গাড়ি নেই। দোতলায় সাহেবের ঘরটাও ফাঁকা। সাহেব হয়ত ড্রাইভারকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বেরিয়েছে ভেবে ফুলি রানা বান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরদিন দুপুরে লোকমান বাড়ি ফিরলে সাহেবের হঠাৎ গ্রামে আসা এবং না বলে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা ফুলি স্বামীকে অবগত করে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ঢাকা থেকে যে কোন মুহূর্তে দুঃসংবাদ প্রাপ্তির আশঙ্কায় পরবর্তি ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু দিন কতক পর খবর আসে যে *ছুডো আফা* অর্থাৎ ফারহানা আল্লাহর অশেষ রহমতে সুস্থ্য হয়ে উঠেছেন। আর পাগলির অন্তর্ধাণ নিয়ে তারা কখনই মাথা ঘামায়নি , কেননা পাগলি মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায়। পনের দিন, বিশ দিন, কি এক মাস কোন খবর থাকে না। আবার হঠাৎই এসে একদিন হাজির হয়।

॥সাত॥

সাইফুল মাস্টারের বসত বাটি মুল সড়কের একটু ভেতরে। দেওয়ান মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে সড়ক ধরে পশ্চিম দিকে মিনিট পাঁচেক হাটলে বাঁ দিকে একটা সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। সরু রাস্তার দুই পাশে ঘন বাঁশ ঝাড়। কিছুক্ষণ আগে মেঘের তর্জন গর্জন শোনা গেলেও এখন থেমে গেছে। তবে বাতাস এখন আগের মতই জোরে সোরে বয়ে চলেছে। দমকা বাতাসে লকলকে বাঁশের অগ্রভাগ নুইয়ে এসে ধরণীকে যেন চুম্বন করতে চাইছে। আনন্দে আত্মহারা বাঁশের কঁচি পত্র পল্লব কেঁপে কেঁপে হেলে দুলে নেচে 'শো শো' শব্দের কোরাস গেয়ে চলেছে বিরামহীন। ঝোপ পেরিয়ে রাস্তাটি কারো বাড়ির উঠোনে গিয়ে থেমে যায়। মানুষের পদ শব্দে উঠোন থেকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে একটি কুকুর।

- তু তু তু বাঘা বা আ ঘা।

মাস্টারের ডাক শুনে বাঘা ঘেউ ঘেউ থামিয়ে লেজ নেড়ে মনিবের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে ঘোত ঘোত শব্দ করতে থাকে।

- বাড়ি একেবারে অন্ধকার দেখছি। কারেন্ট নাই নাকি? প্রশ্ন করে ফয়সাল।

- নাহ, বিজলি বাতিতে গ্রামের গ্রামত্ব থাকে না। আপনি একটু দাঁড়ান জনাব, আমি সত্বর হেরিকেনটা প্রজ্বলিত করে নিয়ে আসি।

পড়শী বাড়ির ইলেকট্রিক বালবের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মাস্টারের আঙ্গিণায় এসে আঁধারের সাথে সখ্যতা করে নিয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোয় চারদিকের অচেনা পরিবেশটা পরখ করে নেয় ফয়সাল। বাড়িতে সর্বসাকুল্যে ঘর দুইখানা। টিনের চার চালা ঘরটা দক্ষিণ দিক মুখ করা, আকারে উলটো দিকের ছনের ঘরটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়। ঘরটির চারদিকে তালাই

বাঁশের বেড়া, কাঁচা মাটির ভিটা- আঙ্গিণা থেকে হাত তিনেক উঁচু। গাছের মোটা গুড়ি আর বাঁশের খোটা সহযোগে চার ধাপের একটা সিঁড়ি বানানো হয়েছে উঠোন থেকে ঘরের বারান্দায় পা রাখার জন্য। সেই সিঁড়ি বেয়ে এক চিলতে বারান্দা পেরিয়ে ঘরের তালা খোলে মাস্টার। ক্যার ক্যার আওয়াজ তুলে বহু পুরাতন কাঠের দরজা প্রতিবাদ জানায়।

ঘরের ভেতর আসবাব পত্রের বাহুল্য নেই। দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় দখিনের জানালা ঘেঁষে মাঝারি আকৃতির কাঠের চৌকি পূর্ব পশ্চিম দিক করে পাতা। চৌকির ওপর শীতল পাটি বেছানো। চৌকির বিপরীতে উত্তরের জানালা সামনে রেখে পড়ার টেবিল, টেবিলের ওপর একটা বাঁশের বাঁশি আর এক গাদা বই পুস্তক স্তুপ মেরে রাখা। পশ্চিম দিকে বেড়ার সমান্তরালে দাঁড় করানো মজবুত কাঠের আলমারী আর তার পাশে ছোট্ট আলনা।

- বাহ চমৎকার ঘরখানাতো।

- দরিদ্রের দুরাবস্থা নিয়ে কৌতুক করছেন মহোদয়? জানি কষ্ট হবে। কিন্তু একটা মাত্র নিশী কোনমতে গুজরাণ করে দেন ।

- আমি কিন্তু কৌতুক করিনি মাস্টার সাহেব। আই ওয়াজ সিরিয়াস। ফয়সালের কথায় সাইফুল মাস্টার সন্তুষ্ট না বেজার হয় তা বোঝা যায় না। আলনায় ভাঁজ করে রাখা লুঙ্গি ফয়সালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে- নেন সাংবাদিক সাহেব, এইটা পরিধান করেন। নতুন না, তবে ধোয়া জিনিস।

- ছার কি ঘরে আছেন? দুয়ার থেকে নারী কন্ঠের ডাক আসে।

- কে শরিফা? আস ভেতরে আস। বার তের বছরের এক বালিকা দরজায় উঁকি মারে।

- ছার মা কইল--

মাস্টারের সাথে অপরিচিত একজনকে দেখে মাঝপথে কথা থামিয়ে দেয় শরিফা।

- শরিফা লজ্জার কিছু নাই। উনি আমার এক বন্ধু, ঢাকা থেকে আসছেন সাংবাদিক। তোমার মা'কে গিয়ে বল দুইজনের ভাত পাঠিয়ে দিতে।

- জ্বী, আইচ্ছা। বালিকাটি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে ফিরতি পথ ধরে ।

- মেয়েটি কে? প্রশ্ন করে ফয়সাল।

- আমার ছাত্রী। মেয়েটার মা বাবা অতিশয় ভাল মানুষ। এই যে বাড়িটা দেখছেন, এটা আসলে আমার না। শরিফাদেরই পরিত্যাক্ত ভিটা । আমাকে থাকতে দিয়েছে। পরের জায়গা পরের জমি, ঘর বানাইয়া আমি রই, হেহে হেহে - চলেন খাবার আসতে আসতে কুয়ো তলা থেকে হাত মুখ ধৌত করে আসি।

হাত মুখ ধুয়ে আসতে আসতে খাবার চলে আসে। ব্যঞ্জণ অতি সামান্য। লাল আউশ চালের ফ্যানা ওঠা ভাত, করল্লা ভাজি, ইচা মাছ দিয়ে মজানো ডাটার তরকারি, মাসকালাইয়ের ডাল। ক্ষুধার্ত ব্যঘ্রের মত ভাতের থালার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে ফয়সাল। হাপুস হুপুস শব্দ করে কাঁসার বাসন সহ আঙ্গুল চেটে পুটে আহার সমাপ্ত করে সে।

খাওয়া শেষে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয় ফয়সাল। কিছুক্ষণ পর সাইফুল মাস্টারও ফয়সালের পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

- পাগলির ব্যাপার কিছু বুঝলেন মাস্টার সাহেব? দেওয়ান মঞ্জিল থেকে আসার পর এই প্রথম খোরা পাগলনীর ব্যাপারে প্রশ্ন করে ফয়সাল।

- হুম, বুঝলাম। আর যা বুঝলাম, তাতে আপনাকে সামনে অনেক কঠিন বাঁধার সম্মুখিন হতে হবে। পারবেন তো?

- ওপর ওয়ালার ইচ্ছা হলে পারব নিশ্চয়ই।

- কালকে সকালে লোকমানকে সাথে নিয়ে থানায় গমন করা যাক কি বলেন? নাগরপুর থানার ওসি আমার অতি ঘনিষ্ঠ জন। আমরা একসাথে থেকেছি বহু দিন। সলিমুল্লাহ হলে।

- থানায় গিয়ে লাভ নেই। ওরা তো --

- এই কথাটা ঠিক বললেন না সাংবাদিক সাহেব। প্রশাসনের ওপর আস্থা হারালে তো আমার আর আপনার চলবে না। প্রশাসনকে অবজ্ঞা করা মানে আইনের শাসনকে অবজ্ঞা করা। হুট করে তো আর আপনি পুলিশ, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা এসবে পরিবর্তন আনতে পারবেন না। নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের নিয়ম ভেঙ্গে নতুন নিয়ম গড়তে হবে। রেভুলেশনারী কিছু- না গ্র্যাজুয়াল চেইঞ্জ। দুঃখিত জনাব ছোটখাটো একটা লেকচার দিয়ে ফেললাম। বিরক্ত হয়ে থাকলে নিজ

মহিমায় মার্জনা করে দেবেন। আসলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করতে করতে সবাইকে ছাত্র ভেবে উপদেশ ফরমানোর বদভ্যাস হয়ে গেছে।

- না না সাইফুল সাহেব আমি কিছু মনে করিনি। আপনার কথায় যুক্তি আছে। আচ্ছা মাস্টার সাহেব আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব?

- নির্দ্বিধায় করতে পারেন মহোদয়।

- পথে আসার সময় আপনি বলছিলেন যে এই গাঁয়ে আসা অব্দি পাগলিকে দেখে আসছেন। আপনার বাড়ি কি এই গ্রামে না?

- না। আমার আদি নিবাস বিক্রমপুরে- সরিষাবন গ্রাম।

- এই অজ পাড়াগাঁয়ে একলা পড়ে আছেন- পরিবার পরিজন ফেলে---

ফয়সালের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না মাস্টার। দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে শুধু একটা।

- আপনি মানুষটা খুব ভাল মাস্টার সাহেব, আবার সেই সাথে বেশ রহস্যময়। আপানার সম্পর্কে জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

- কি করবেন আমার কথা শুনে। অতি সাধারণ, সাদামাটা, বাংলা সিনেমার সস্তা, মচমচে চানাচুর মার্কা কাহিনীর মত।

- বলতে না চাইলে জোর করব না। তবে ঐ যে বললাম কৌতুহল হচ্ছে খুব।

- শোনেন তবে। তখন যৌবন বয়স, সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি, অর্থনীতিতে এম, এ। রঙ্গিন সব স্বপ্ন সাবানের বুদবুদের মতই রঙবেরঙের ফানুস হয়ে ভেসে বেড়ায়। পার্থিব চাওয়াগুলো চোখের সামনে চড়াই পাখীর মত তিড়িং বিড়িং করে পুচ্ছ নাচায়। একবার থাবা মেরে ধরতে পারলেই আমার- সব আমার। মোহ, মোহ- ভালো বেতনে চাকুরীর মোহ। বসুন্ধরা বা বারিধারায় না হলেও ঢাকা শহরে বা তার আশপাশে মাথা গোঁজার মত একখন্ড জমির মালিক হবার মোহ। সেই জমিতে আলিশান না হলেও- মানানসই, ভদ্রচিত পাখীর নীড়ের মত ছোটোখাটো একটা ঝুপড়ির মোহ। নিশুতি রাতে সুন্দরী, যুবতি অঙ্কসঙ্গিনীর কোমল উষ্ম বক্ষে শির রেখে শান্তির নিদ্রার মোহ। মোহের আদি আছে অন্ত নাই।

চাকরী একটা পেয়ে গেলাম- বেসরকারী ব্যাংকে, বিদেশী মালিকানাধীন। বেতন মন্দ না। ধমনীর চনমনে রক্ত তাগিদ দিতে শুরু করল- বিবাহ কর হে সাইফুল, বিবাহ কর। দেরি কিসের? শুভশ্য শীঘ্রম। পাত্রি জুটে গেল। মধ্যবিত্ত পরিবারের, অতি সুন্দরী, নাম জাহানারা। অতি সুন্দরী হলে যা হয়, মহল্লায়, স্কুলে, বাসে ট্রেনে, রাস্তা ঘাটে, আচার অনুষ্ঠানে মৌমাছির ঝাক- গুঞ্জণ তোলে, মধু খেতে চায়। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করার ফুরসত মেলে না তাই জাহানারার। সৎ পাত্র পেয়ে কোনমতে গছিয়ে দিতে পারলে বাঁচে বদনামের ভয়ে সদা তটস্থ পিতা মাতা। ছাত্র জীবনে গল্প কবিতা লিখতাম- সুন্দরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। বয়স, শিক্ষা দীক্ষা, মনমানসিকতা কিছুই বিবেচনায় আনলামনা। হুট করে শুভ কাজটা সেরেই ফেললাম। কণ্ঠ বেশ মিষ্টি ছিল মেয়েটার। জোৎস্না রাতে বেলকনিতে কি ছাদে একান্ত সান্নিধ্যে নববধূর সুললিত কণ্ঠ নিঃসৃত গুন গুন সঙ্গিতের মূর্ছনা- ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, অথবা যা আ আ রে যারে উড়ে যারে পা আ খি ই, মন্দ কাটত না দিন গুলো। তবে সঙ্গীতের চাইতে অভিনয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল জাহানারা। বিয়ের আগে মৌমাছির পালের মধ্যে কতিপয় শুভাকাঙ্খিও ছিল। শুভাকাঙ্খার ফেরিওয়ালা- সহকারি পরিচালক, প্রযোজক, ক্যামেরাম্যান, ফটোসাংবাদিক, নাট্যকার। বিয়ের মাস দুয়েক পার না হতেই ফেরিওয়ালারা একে একে আবার ফিরে আসতে শুরু করে। এবারে শুধু শুভাকাংখার ফেরি না, সাথে স্বপ্নের ফেরি। ফটো সুন্দরী হওয়ার স্বপ্ন, হিট মডেল হওয়ার স্বপ্ন, এ ক্লাশ নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন- আরও কত শত স্বপ্ন। প্রথমে বাঁধা দিয়েছি অনেক- শান্তিপূর্ণ ভাবে। কিন্তু মেয়েলোকের ঐ এক অস্ত্র- কান্না। নাকের পানি চোখের পানির স্যালাইন, অনশন ইত্যাদি ইত্যাদি। কঠোর হতে পারিনি কখনও। ততদিনে সংসারে নতুন অতিথি এসে গেছে। জাহানারার মা বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন মেয়েকে ধরে রাখার। আমাকেও উনারা বহু বার সাবধান করেছেন- বাপুরে ব্যাডা মানুষ এত নরোম হইলে চলে না। মেয়েলোক জাত হইতেছে বান্দর সমান। বান্দররে লাই দিলে ফাল দিয়া মাথায় ওঠে। মাথা থিকা ঘরের চালে, চাল থিকা আরেক ফালে গাছে। একবার গাছে উঠলে আর রক্ষা নাই- এ গাছ থিকা ও গাছ। আর ধরবার পারবা না।

জাহানারাকে সত্যিই ধরে রাখতে পারিনি আমি। ইতিমধ্যে দু'দুটো ছবিতে সাইড নায়িকার

রোলে অভিনয় করে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যমণি হয়ে গেছে সে। ফিল্ম জগতে কেউ অবশ্য তাকে জাহানারা নামে চেনে না। অন্য একটা নাম আছে- পোশাকি নাম। পোশাকি নামের আড়ালে এক ডানাকাটা পরী, মাটিতে পা পড়ে না। ডানা ছাড়াই উড়তে চায়। অনেক রাতে ঘরে ফেরা- বেসামাল হয়ে। আবার কখনও কখনও রাতে ঘরে না ফেরা। সংসার আর শিল্পী প্রতিভার উন্মেষ- এক সাথে হতে পারেনা। একটা পেতে হলে অন্যটা বিসর্জন দিতে হবে। তাছাড়া পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, অন্যকে গন্ধ বিলিয়েই তার সুখ। দিন দিন পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠছিল। মেয়েটার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বলতে গেলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। জাহানারা মনে হয় তৈরীই হয়ে ছিল। ডিভোর্সের কথা পাড়তে দেরি আছে কিন্তু উকিল মোক্তার দিয়ে ফাইনাল ছাড়পত্র রেডি করতে এক দিনও দেরি নাই। সংসারের মায়া জাল ছিন্ন করেই প্রথমে ব্যাঙ্কের চাকুরীটা ছেড়ে দিলাম। এক বন্ধুর সহযোগিতায় গ্রামের স্কুলের মাস্টারিটা জুটে গেল। ব্যস মেয়েটাকে আমার এক দুঃসম্পর্কের খালার কাছে রেখে চলে এলাম। সাইফুল ব্যাঙ্কার থেকে সাইফুল মাস্টার। এই পর্যন্ত বলে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে চুপ মেরে যায় মাস্টার।

- নতুন করে সংসার জীবন শুরু করার কথা ভাবেননি আর?

- নাহ। আবার সেই অজানা অচেনা, আনজান এক নারীর সাথে ভালবাসা ভালবাসা অভিনয়, আশা আকাংখা, চাওয়া পাওয়া মান অভিমান, ঝগড়াঝাটি, কোমল মাংসের গন্ধ, উষ্ম নিঃশ্বাস, সৃষ্টি সুখের উল্লাশ, ভাঙ্গা গড়ার খেলা- মোহ সব মোহ। মানুষের জীবন হচ্ছে একটা রেল যাত্রা- এ জার্নি বাই ট্রেইন। হুট করে স্টেশনে এসে থামে ট্রেন। স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে একটু আয়েশ করে বসতে না বসতেই বেলা ফুরিয়ে যায়, ফিরতি ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠে। বেশির ভাগ যাত্রিই আবার এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পায় না, আয়েশ করে বসা তো দিল্লী দূরস্ত। আনসার্টেইনিটি, অনিশ্চয়তা, মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধুই অনিশ্চয়তা। অথচ এই অনিশ্চিত জীবনে মানুষের সীমাহীন চাওয়া। চাওয়া পাওয়ার অক্ষে আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো লাটিমের মত পাক খায় শুধু। একবার যখন মুক্তি পেয়েইছি তখন আর নতুন করে চাওয়া পাওয়ার অক্ষে ঘুরপাক খেতে চাইনা। এই তো বেশ আছি। একে একে দিন গড়িয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর, বছর ঘুরে নতুন বছর। আর শুধু অপেক্ষা- ফিরতি ট্রেনের হুইসেলের অপেক্ষা।

- মেয়েকে দেখতে মন চায় না?

- চায়। খালার কাছ থেকে এনে ভারতেশ্বরী হোমসে ভর্তি করে দিয়েছি। পনের দিন অন্তর কি মাসে একবার গিয়ে দেখে আসি। কাছে টেনে নেই না, বুকে জড়িয়ে ধরি না। শুধু চোখের দেখা দেখে আসি। কী লাভ মিছে মিছি মায়া বাড়িয়ে।

- আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর কোন খবর রাখেন না? এখনও কি অভিনয় করে?

- জানিনা। করে নিশ্চয়ই। বছর কয়েক আগে একবার পত্রিকায় দেখলাম এ্যারেস্ট হয়েছে- অভিযোগ গণিকা বৃত্তির। তখনও সভ্য জগতের মায়া পুরোপুরি ছাড়তে পারিনি। পত্র পত্রিকা পড়তাম। আজকাল আর পত্রিকা ফত্রিকা পড়া হয়ে ওঠেনা। সে যাক, কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম। বিরক্ত হয়েছেন জানি। নিজ গুনে ক্ষমা করে দেবেন জনাব। আসলে এই গ্রামে আসা অবধি আমার কথা কাউকে কখনও বলিনি। একমাত্র পাগলিকে বলতাম। একবার না বহুবার। গ্রামে থাকলে মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় এসে হাজির হত পাগলি। আমি বাড়ি না থাকলেও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বারান্দার এক কোনায় চুপ চাপ বসে থাকত। মাঝে মাঝে এসে দেখতাম মাটিতে পড়ে ঘুমাচ্ছে পাগলি। পাশেই, একেবারে গা ঘেষে মাটিতে চোঁয়াল ঠেকিয়ে ঘোত ঘোত নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাঘা। মানুষ আর কুকুরের এতটা নিবিড় সম্পর্ক ইতিপূর্বে আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। শহরে বা পশ্চিমা দেশে সাহেব মেমসাহেবেরা হয়ত পোষা কুকুরকে নিয়ে এক বিছানায় ঘুমায়, এক পাত্রে আহার করে। কিন্তু সেগুলো সবই অপ্রয়োজনে, শখের বশবর্তী হয়ে। পাগলি আর বাঘার সম্পর্কটা ছিল প্রাকৃতিক- স্পনটেনিয়াস রিলেশন।

মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসত পাগলি। কোন কথা বলত না। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকত শুধু। চোখ দুটো অসম্ভব মায়াবী ছিল। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় কি দুয়ারে চেয়ার পেতে বসতাম আমি। খানিক দূরে মাটিতে পা মেলে বসত পাগলি, পাশে বাঘা। আমি আমার কথা বলতাম। পাগলি শুনত। আমার মেয়েকে ঘিরে অতীত স্মৃতি যখন রোমন্থন করতাম, তখন

পাগলীর চোখে পানি গড়িয়ে পড়ত। পাগলি ঝর ঝর করে কাঁদত আর বিড়বিড় করে বলত- ইসু বিসু দুরিন্নাছ, খান্নাছ, খান্নাছ। কি জানি কি বুঝত। হয়ত বা ওরও কোন অতীত পাঁচালি ছিল, ঘর ছিল, সংসার ছিল, সন্তান ছিল। পাগল মানুষ বলতে পারত না, কেউ শুনতেও চাইত না। এখন তো সে সব বলা না বলা, বোঝা না বোঝা, জানা না জানার উর্ধ্বে।
শেষের দিকে মাস্টারের কণ্ঠ আঁর্দ্রতায় ভারি হয়ে আসে।
- মাস্টার সাহেব আপনি কি কাঁদছেন?
- কি ই জানি, যতই ভাবি এই সংসারের মোহ মায়ায় আর নিজেকে জড়াবো না, তবুও বারবার মায়া এসে আমাকে জড়ায়- অক্টোপাসের মত, আষ্টেপৃষ্ঠে।
- মাস্টার সাহেব আপনার পড়ার টেবিলে বাঁশি দেখলাম, বাজাতে পারেন নাকি?
- বাজাই মাঝে মাঝে। যখন মন খারাপ থাকে।
- একটাবার বাজাবেন?
মাস্টার কোন দ্বিরুক্তি করে না। টেবিলের ওপর থেকে বাঁশিটা এনে আবার বিছানায় ফিরে আসে সে। শীত শীত লাগছে ফয়সালের। পায়ের কাছ থেকে দুমড়ানো মুচড়ানো কাঁথাটা গায়ে টেনে নেয়। বাঁশিতে অধর ছোয়ায় সাইফুল। অধরের ছোঁয়ায় মৃত বাঁশের বাঁশিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে। বাইরের অন্ধকার চোখ সয়ে গেছে ফয়সালের। কবাট ভাংগা খিড়কির নড়বড়ে লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালে এক চিলতে উঠোন। উঠোন শেষে বুনো ঝোপ ঝাড়, লতা গুল্মের জড়াজড়ি - কি অপূর্ব এক মায়ার বাঁধন। মাস্টারের গহন মনের পুঞ্জিভূত দুঃখমালা বাঁশিতে করুন সুরের ঝংকার তোলে। করুন সুরের সেই ঝংকারে ঘরের ভারি বাতাসে কম্পন ওঠে। কম্পিত বাতাস খোলা বাতায়ন আর ভাংগা বেড়ার ফোকর গলে, শুন্য আঙ্গিনা পেরিয়ে, লতা গুল্মের কপোল চুমে, দূ উ রে এক মেঠো পথের বাঁকে এসে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। পায়ে চলা মেঠো পথ এঁকে বেঁকে আরও দূরে দিগন্ত এফোঁড় ওফোড় করে সীমাহীন এক শূন্যতার জঠরে বিলীন হয়ে গেছে। সেই শূন্যতার একান্ত সান্নিধ্যে স্পষ্ট এক নারী অবয়ব দেখতে পায় ফয়সাল। পা মেলে বসে আছে নারীটি। হাতে মাটির খোরা, জটা ধরা কেশ, মায়াবি অক্ষিযুগল।

॥আট॥

খুব সকালে, সূর্য তখন মাত্র উঠি উঠি করছে। বাইরে মৃদু কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেংগে যায় ফয়সালের। চোখ মেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে। মাস্টার কাদের সাথে যেন নীচু স্বরে কথা বলছে। আড়মোড়া ভেংগে বিছানা ত্যাগ করে ফয়সাল। আলনায় রাখা শার্টটা গায়ে চাপিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বারান্দা আর দুয়ার মিলে জনা পনের নারী পুরুষ, বিক্ষিপ্ত ভাবে জটলা করে আছে। ফয়সালকে আসতে দেখে জটলার গুঞ্জণ খামোশি মেরে যায়। কথা বন্ধ করে ফয়সালের দিকে এগিয়ে আসে মাস্টার।
- ফয়সাল সাহেব, ইনারা এই গ্রামেরই মানুষ, পাগলির মৃত্যুর খবর শুনে এখানে জড় হয়েছে। আপনার মুখ থেকে বৃত্তান্ত শ্রবন করতে চায়। মাস্টার এতক্ষণ যার সংগে কথা বলছিল, সেই লোকটি এবারে এগিয়ে আসে। দেখেই মনে হয় মাতব্বর গোছের কেউ হবে।
লোকটি নিজের পরিচয় দেয়- আমি জলিল মেম্বর। ঘডনাডা কি অইছিল সাম্বাদিক সাব? আপনে কি লাশ নিজ চক্ষে দ্যাখছেন? এমুন আকামডা করল ক্যাডা?
শেষের দিকে উত্তেজিত হয়ে পড়ে জলিল মেম্বর। লোকমান বা তার স্ত্রী সকালের মধ্যেই খবরটা চাউর করলেও, দেওয়ান সাহেবের সংগে পাগলি হত্যার যোগসুত্রের ব্যাপারটি নিশ্চিত গোপন করে গেছে, ভাবে ফয়সাল। দেওয়ান সাহেব জড়িত থাকার ব্যাপার ঘুনাক্ষরে টের পেলে, গ্রামের নিরীহ মানুষগুলো সাতসকালে মানবতা দেখাতে আসত না। মনে মনে এই অশিক্ষিত দম্পতির বুদ্ধির তারিফ করে ফয়সাল। সেই সাথে পাগলীর প্রতি গ্রামবাসীর নির্ভেজাল মমতাবোধ প্রত্যক্ষ করে যারপরনাই বিমোহিত হয়। উপস্থিত জটলার কৌতূহল নিবৃত করতে পুরো ঘটনা পেশ করে ফয়সাল, তবে দেওয়ান সাহেবের যোগসাজসের ব্যাপারটা চেপে যায়।
আফসোসের তো তো ধ্বনি, আহারে, অভাগীর বেডি, বড় ভালা ছিল, দুইন্যাডা শয়তানে ভইর্যা গেছে- জটলা থেকে নানা ধরণের গুঞ্জন ভেসে আসে। খোবিশ তুল্য অদৃশ্য হত্যাকারীকে অভিসম্পাত করে কেউ কেউ। সকাল দশটার দিকে ছোট খাটো একটা মিছিল সলিমাবাদ গ্রাম

থেকে সড়ক ধরে নাগরপুরের দিকে যাত্রা করে। পাগলীর প্রতি সহমর্মী এই মানুষগুলোর গন্তব্য নাগরপুর থানা।

থানার ওসি মাহফুজ চৌধুরীকে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি বলেই মনে হল ফয়সালের। গ্রামবাসীর দাবীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভুতি প্রদর্শন করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু খুনটা এই থানায় হয় নাই, লাশও থানা কর্তৃপক্ষের কাছে নাই, আর আদৌ খুনের ঘটনা ঘটেছে কিনা সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ লিগ্যালি ওয়াকিবহাল না। ঢাকা থেকে আসা এক সাংবাদিকের মৌখিক বয়ানে হত্যা মামলা দাখিল করা আইনত সম্ভব না। ব্যক্তি মাহফুজ হিসেবে তিনি বিশ্বাস করেন যে এটা হত্যা কান্ড না হলেও অস্বাভাবিক মৃত্যু- জলবত তরলং। হত্যা মামলায় পুলিশের অকুস্থল পরিদর্শন, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট, ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ফ্যাকড়া। মৃত দেহ পাওয়া গেছে বুড়িগংগা ব্রিজের নীচে আর পোস্টমর্টেম হয়েছে মেডিকেলে। কাজেই হয় কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ অথবা রমনা থানা পুলিশ বাদি হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করার কথা। মাহফুজ নিশ্চিত- এধরণের কোন মামলা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সে যে কোন কারণেই হোক, এখনও দায়ের করা হয়নি। পুলিশ হয়েও অন্য পুলিশ ভাইদের সম্পর্কে এধরণের অপ্রিয় সত্য কথা বলা তার উচিৎ না, কিন্তু অপ্রিয় হলেও এটাই সত্য। গ্রামবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে মাস্টারকে পরামর্শ দেয় মাহফুজ চৌধুরী- শোন সাইফুল তোমরা একটা জিডি কর, নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত। আর ফয়সাল সাহেবের কাছ থেকে স্টেইটমেন্ট রেখে দিচ্ছি। আই প্রমিজ আই উইল ডু মাই বেস্ট।

থানার কাজ সারতে সারতে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। এবারে বিদায়ের পালা। বি আর টি সি বাসে উঠে বসে ফয়সাল। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো জনা পনের মানুষ। চোখে মুখে তাদের কৃতজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। স্টেশনে এত মানুষ বিদায় জানাতে এসেছে দেখে স্থানীয় লোকজন, বাসের অন্যান্য যাত্রী উৎসুক হয়ে ফয়সালের দিকে তাকায়। পথচারীরা হাঁটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে- *গডনাডা কি?* নামি কোন ফিল্ম স্টার বা ডাকসাইটে কোন নেতা, বা এ জাতীয় বিখ্যাত কাউকে আশা করেছিল হয়ত তারা। ক্যামেরা কাঁধে সাদা মাটা পোষাকে ফয়সালকে দেখে তারা সবাই আশাহত হয়। পথচারী পথ চলে, চা ওয়ালা চায়ের কাপে চামচের ঝড় তোলে, রিক্সা চালক ঘন্টা বাজায়- টুং টাং, কন্ডাক্টার হাঁক ছাড়ে- ডাইরেক্ট ডাকা, ডাইরেক্ট ডাকা, যাত্রীরা মনোনিবেশ করে সহযাত্রীর সাথে বাক্যালাপে, ড্রাইভার হর্ন বাজায়- পঁ পঁ, বাসের চাকা ঘোরে।

ধীরে ধীরে দৃশ্যের আড়ালে চলে যায় গ্রাম বাসী, চা স্টল, ভাংগা বেড়া। আর হয়ত কোনদিন ফয়সালের আসা হবে না এই গাঁয়ে। কত টুকু আর দূরত্ব পঞ্চাশ কি ষাট কিলোমিটার। অথচ এই দূরত্ব টুকু হয়ত এ জীবনে আর অতিক্রম করা হয়ে উঠবে না। অনিশ্চিত মানুষের জীবন, এই আছে এই নাই। এই আছে এই নাইর সংসারে তবুও প্রতিনিয়ত মায়ার বাঁধন মাকড়শার জালের মত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। কেন করে? বাসের গতি খানিক শ্লথ হয়। সামনে মাল বোঝাই গরুর গাড়ি- ক্যার র, ক্যার র শব্দ তুলে মন্থর গতিতে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। হর্ণ বাজাতে বাজাতে কোন মতে গরুগাড়ি গুলোকে পাশ কাটায় বাস চালক। আবার গতি বাড়ে। রাস্তার দুই ধারে সারিবদ্ধ ভাবে পোঁতা বাবলা গাছ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে দৃষ্টির আড়ালে উধাও হয়ে যায়। মানুষের বেশির ভাগ মায়াই বুঝি অতীতকে ঘিরে। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটে গেল, তা ই এখন অতীত। হাত বাড়ালে ধরা যায় না, মন বাড়ালে ছোঁয়া যায়। গতরাত, অচেনা অজানা এক গন্ড গ্রাম, অপরিচিত মহাত্মা এক স্কুল শিক্ষক, তার আতিথেয়তা, গ্রামবাসীর অনুকূল দৃষ্টি, খানিক আগে পাশ কাটানো গরুর গাড়ি আর চোখের পলকে উধাও হওয়া বাবলা গাছের সারি- এর সব এখন অতীত, মায়াময় অতীত।

॥নয়॥

দেওয়ান গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইসমাঈল দেওয়ান অতিশয় ব্যস্ত মানুষ। ডিগ্রী পাশ করার পর জনতা ব্যাংকের কেরানী হিসেবে তার কর্ম জীবন শুরু। স্বল্প বেতনের সরকারী চাকুরী, উপরির কোন সুযোগ নাই। চাকুরীতে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন না হলেও, ঘরের লক্ষ্মী তার ভাগ্যকে প্রসন্ন করে তোলে। স্ত্রী মর্জিনা পিতার বড় সন্তান। শাশুড়ী গত হয়েছেন অনেক আগেই। বলা নেই কওয়া নেই বিনা নোটিশে শ্বশুর মহোদয় স্ট্রোকে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করলেন। বড় মেয়ে মর্জিনার দায়িত্ব আগেই নিজ স্কন্ধে নিয়েছিলেন দেওয়ান সাহেব- ভর মজলিশে সাক্ষি

সাবুদের উপস্থিতিতে। আর এখন শ্বশুরের আচমকা এবং অকাল প্রয়াণের ফলে এক নাবালক শ্যালক, এক নাবালিকা শ্যালিকা এবং বখশী বাজারে আড়াই কাঠা জমির ওপর দুই তলা দালান সহ বাড়ি- এ সব ভার সাক্ষি সাবুদের তোয়াক্কা না করেই ইসমাঈল দেওয়ানের স্কন্ধে ধপাস করে আছড়ে পড়ল। ব্যাংকের স্বল্প বেতনভুক কেরানী, এত ভার সইবে কি করে? রুপ আর গুনের কিছুটা ঘাটতি থাকায় মর্জিনার স্বামী ভক্তি ছিল আকাশচুম্বি। মর্জিনা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত- তার স্বামী এতিম শ্যালক শ্যালিকাকে কোনদিনই পথে ঠেলে দেবে না। তাই প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়ী আর উচ্চাভিলাষী ইসমাঈল দেওয়ান যখন বখশী বাজারের বাড়ি বিক্রি করে ব্যবসায় লগ্নি করার প্রস্তাব পেশ করল, তখন সেই প্রস্তাব মর্জিনা বিনা সংকোচে পাশ করে দিল।

আশির দশকের শেষ ভাগে ছোটখাটো বাইয়িং হাউজে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজের একসেসরিস কেনা বেচা দিয়ে দেওয়ান সাহেবের সদাগরী জীবনের সূত্রপাত। সেই যে শুরু, এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ছাই মুঠোয় ধরে ফু দিয়েছেন- হায় আল্লাহ, ছাই কোথায়, এ যে হীরক চূর্ন। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ, ফুড এ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, রিয়াল স্টেইটের ব্যবসা, আমদানি রপ্তানী বাণিজ্য- একে একে সাফল্যের সবগুলো দরজা চিচিং ফাঁক মন্ত্র বলে হুটহাট খুলে গেছে। ইতমধ্যে স্ত্রী গত হলেও তার বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রেখেছেন। শ্যালক শ্যালিকা দ'ুজনেই দেওয়ান গ্রুপের সম স্বত্বাধিকারী। ইহলোক ত্যাগ করার আগে মর্জিনা এক পুত্র আর এক কন্যা সন্তান রেখে গেছে ইসমাঈল দেওয়ানের জিম্মায়। স্বামী হিসেবে বিশ্বস্ত, ব্যবসায়ী হিসেবে ঝানু মিঃ দেওয়ান পিতা হিসেবেও যথেষ্ট সুচারু রুপে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ছেলেটা বড়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে এম,কম করে বর্তমানে ক্যানাডায় আছে। এমবিএ শেষ করে দেশে ফেরার অপেক্ষা মাত্র। আর মেয়েটা নর্থ সাউথে বিবিএ করছে। অঢেল অর্থ সম্পদের মালিক আজকে ঈসমাইল দেওয়ান। তবে আজকের সমাজে শুধু অর্থ কড়িতে ষোল কলা পূর্ণ হয় না। এক কলা অপূর্ণ থেকেই যায়। রাজনীতি হচ্ছে সেই অপূর্ণ কলা। পুরো মন্ত্রী না হলেও হাফ মন্ত্রী, হাফ মন্ত্রী না হলেও দফতর বিহীন মন্ত্রী, দফতর বিহীন মন্ত্রী না হলেও অন্ততঃ এম, পি- এ ছাড়া আজকের যুগে টাকা পয়সা মূল্যহীন। সে মোতাবেক গ্রাউন্ড ওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এলাকায় দাতব্য, নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলা, বড় দুই পার্টিকে চাঁদা দেওয়া, ফুটবল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনের ছয় আর সাত তলা পূরোটা জুড়েই দেওয়ান গ্রুপের মেইন অফিস। সাজানো গোছানো অফিস কক্ষে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন মিস্টার দেওয়ান। আজকাল বড় বেশি নস্টালজিয়ায় ভুগছেন তিনি। জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিয়ে সাফল্যের শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি আজ। সাফল্যের চূড়ায় ওঠার এই পথ কুসুমাস্তীর্ন ছিল না- ছিল কন্টকাকীর্ন , বিপদসঙ্কুল, বন্ধুর। বন্ধুর পথ উত্তরণ দিয়ে কথা। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, হারাম হালাল এসব বিবেচনা করার অবকাশ ছিল না। অতি সামান্য একটি ঘটনা নিয়ে হাওয়া থেকে ন্যায় অন্যায় বোধটা ইদানিং ঘন ঘন মনের দরজায় খট খট করছে। তবে কি তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন? অবচেতন মনকে প্রশ্ন করেন ইসমাঈল দেওয়ান। এটা কি সাময়িক দুর্বলতা? নাকি মৃত্যুর অশনি সংকেত? নিজেকে নিজে অনুপ্রাণিত করেন ইসমাঈল দেওয়ান- ওয়েক আপ, ইসমাঈল, ওয়েক আপ। দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষোচিত নীতিবান মানুষের স্থান পৃথিবীতে অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতে থাকার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ন্যায় অন্যায়, পাপ পুন্য এসবই আপেক্ষিক উপাত্ত। বেঁচে থাকার জন্য- না না শুধু বেঁচে থাকা না, ভাল এবং সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে কোন কৃত কর্ম পাপ হতে পারে না, অন্যায় হতে পারে না। অন্যায় ভেবে সেই কর্মে বিরত থেকে নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়ানো আত্মহননের সামিল। আত্মহত্যা মহা পাপ। মহা পাতকের স্থান দুনিয়াতেও নেই, আখেরাতেও নেই। তুমি যা করেছ তা সহি, পুণ্য, মহাপুণ্য।

ইন্টারকমের যান্ত্রিক শব্দে অবচেতন জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসেন মিস্টার দেওয়ান।

- স্যার, ফয়সাল নামের এক ভদ্রলোক, দৈনিক জনপদের সিনিয়র রিপোর্টার, আপনার সংগে দেখা করতে চাইছেন।

দৈনিক জনপদ শব্দটা সরাসরি ইসমাঈলের হৃৎপিন্ডের প্রাচীরে আঘাত করে, ধ্বক করে হাতুড়ি

পেটা শব্দ হয়। মাথাটা যেন একটু ঝিম মারে। তবে তা ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নেন, সেক্রেটারিকে বলেন- ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও।

ইসমাঈল দেওয়ানের একটা ছবি মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিল ফয়সাল। হিন্দি ছবির খানদানি ভিলেনের মত- দশাসই চেহারা, পেটা স্বাস্থ্য, পুরু গোঁফ, মিশমিশে কালো গাত্র বর্ণ, ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তার সেই কল্পিত পোর্ট্রেট ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। সাদা মাটা নরম দর্শনের একজন মানুষ। ভদ্রলোকের পরনে দামি স্যুট, ক্লিন শেভড, বয়স জনিত কারণে ধূসর হয়ে যাওয়া কেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো। অনেকটা সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের মত। কলমের খোঁচায় বহু মানুষের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করলেও, বাস্তবে পিঁপিলিকা মারতেও যাদের হাত কাঁপে। যাদের অবসর কাটে বই পড়ে, ফুল গাছের যত্ন নিয়ে আর আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করে- সুখই সুখ। প্রথম দর্শনে ইসমাঈল দেওয়ানকে সে রকমই একজন সুখী মানুষ মনে হল ফয়সালের কাছে।

- হ্যা বলেন, কি নাম যেন আপনার? আফজাল সাহেব?

- জ্বীনা, ফয়সাল। ফয়সাল আহামেদ।

- সরি সরি, আসলে আমার শ্যালকের নাম আফজাল, প্রিয় মানুষ। তাই এই নামটা সবসময় মুখে আসে। তা বলেন ফয়সাল সাহেব কি করতে পারি আপনার জন্য। প্রশ্নের একটা খসড়া এখানে আসার আগে মনে মনে তৈরী করে এনেছিল ফয়সাল। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন গুলো ঠিক মনে পড়ছে না। আসলে এতটা আশা করেনি সে। ইসমাঈল সাহেবের মত একজন ব্যস্ত লোককে প্রথম দিন এসেই অফিসে পাওয়া, বিনা এ্যাপয়েন্টমেন্টে সাক্ষাৎ, কাল্পনিক চেহারার সাথে বাস্তবের চেহারার অমিল এবং সব শেষে ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে ফয়সালের সাজানো প্রশ্ন গুলো গুবলেট হয়ে গেছে। কোথা থেকে কিভাবে শুরু করা যায় তা ভাবতে থাকে সে। সাদা শার্ট আর টাই পরা পিয়ন এসে দু'কাপ ধুমায়িত কফি টেবিলের ওপর রেখে যায়। পিওনটির শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? নিশ্চয়ই ডিগ্রী পাশ। লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে মন চায় ফয়সালের।

- কফি নেন ফয়সাল সাহেব। মোকা জাভা, সরাসরি কলম্বিয়া থেকে এসেছে। কফির কাপ হাতে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চুমুক দেয় ফয়সাল। তিক্ত গরম তরলে ছোঁয়া লাগানোর সাথে সাথে জিভ স্পন্টেনিয়াস প্রতিক্রিয়া দেখায়। কাপ থেকে খানিকটা কফি ছলকে ফয়সালের শাদা শার্টে ভরে। টিসু পেপার এগিয়ে ধরেন ঈসমাইল।

- আপনি কি কোন কারণে নার্ভাস ফয়সাল সাহেব?

- জ্বী, না মানে কফিটা খুব গরম। আপ্রাণ চেষ্টা করছে ফয়সাল নার্ভাসনেস কাটিয়ে ওঠার জন্য।

- হ্যা গরম। তাড়াহূড়ার কিছু নাই, খান, ধীরে ধীরে খান। তা কি যেন বলছিলেন ?

- আপনার মেয়ের শরীর এখন কেমন? ফয়সালের গলার স্বর কাঁপা কাঁপা।

- জ্বী, আলহামদুলিল্লাহ।

- কোথা থেকে কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করালেন, ঢাকাতেই? আগের চেয়ে কণ্ঠস্বর একটু কম কাঁপছে এখন।

- জ্বী, ঢাকাতেই? ভাবাই যায়না, চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা এতটা এগিয়ে গেছি। কেন যে মানুষ খামোখা পয়সা খরচ করে বিদেশে চিকিৎসা করতে যায়, বুঝি না। আসলে এদের মধ্যে দেশপ্রেমের বড় অভাব।

- কিডনি কে ডোনেট করল, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ?

- না আ –- ওয়েট এ মিনিট, আপনি এতকিছু জিজ্ঞেস করছেন কেন? ডু আই নো ইউ?

- কারণ আছে ইসমাঈল সাহেব। মানবিক কারণ। আমাদের দেশে কিডনির কেনা বেচা অনেক সময় ব্ল্যাকমার্কেটে হয়।

- আই এ্যাগরি উইথ ইউ। কিন্তু আমাকে এসব শোনাচ্ছেন কেন?

- আপনি পাগলিকে চেনেন? খোরা পাগলনি?

- ভাইরে, আমি ব্যস্ত মানুষ। পাগল ছাগল চেনার সময় কোথায়?

বুক পকেট থেকে মর্গে তোলা ছবিটা টেবিলের ওপর রাখে ফয়সাল।

- পাগলি, খোরা পাগলনি। গত ২৩ শে আগস্ট, ২০০৩ সোমবার। পাগলির দেহে অস্ত্রপচার করে একটা কিডনি অপসারন করা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অথবা অযত্নের ফলে, সেই দিনই মহিলা

মারা যায়। মারা যাওয়ার পর তার লাশ বুড়িগংগায় ফেলে দেওয়া হয়। পরদিন পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মেডিকেলের মর্গে রেখে যায়। দেখেনতো মিস্টার দেওয়ান চিনতে পারেন কিনা।
ছবিটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখে ঈসমাইল। ভুরু কুচকায়, চেনার চেষ্টা করে।
- কি চিনতে পারছেন না? আচ্ছা আমি সাহায্য করছি। পাগলির আদি নিবাস , আসল নাম কেউ জানেনা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার ঠিকানা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সলিমাবাদ গ্রাম।
নিজের কণ্ঠের দৃপ্ততায় নিজেই আশ্চর্য হয় ফয়সাল। ইসমাঈল দেওয়ানের মত একজন জায়েন্টের চোখে চোখ রেখে এতগুলো কথা বলল সে, অথচ একবারও তার কণ্ঠ কাঁপল না!
- হুম, স্ট্রেঞ্জ! মনে হচ্ছে গ্রামে দেখেছি। কিন্তু এ পরিণতি কি করে হল? সো স্যাড। যাই বলেন ফয়সাল সাহেব, আমার কাছে আসার আগে আপনার উচিৎ ছিল পুলিশের কাছে যাওয়া। এনি ওয়ে। একবার যখন ব্যাপারটা আমার গোচরে এসেছে, তখন দায়িত্ব আমিই নিলাম। শত হলেও আমার এলাকার, জাত ব্যবসায়ী হলেও সবার ওপরে আমি একজন মানুষ। থ্যাংকস ভেরি মাচ আফজাল সরি ফয়সাল সাহেব। আই লাইক দ্যাট স্পিরিট। আপনার মত মানবিক গুনাবলি সম্পন্ন সাংবাদিক আজকাল চোখে পড়ে না। খুব শীগগিরই দেওয়ান গ্রুপের মালিকানায় একটা দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। মার্কেটিং পলিসি যা নিয়েছি তাতে পত্রিকাটি প্রথম আলো বা যুগান্তরের মতই পয়লা ধাক্কায় হিট করবে ইনশাল্লাহ। উই আর ডাইং ফর ডেডিকেটেড প্রফেশনালস লাইক ইউ। এই পর্যন্ত বলে দম নেয় ইসমাঈল। বল এখন প্রতিপক্ষের কোর্টে। প্রতিপক্ষের রিএ্যাকসনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে।
- আপনার মেয়েকে কে কিডনি ডোনেট করেছে যেন বললেন?
ইসমাঈল দেওয়ানের প্রস্তাবে কর্নপাত না করে প্রশ্ন পর্ব চালিয়ে যায় ফয়সাল।
- কেউ ডোনেট করেনি। কিনেছি। সামওয়ান সোলড ইট। যিনি বিক্রি করেছেন তার নিষেধ আছে। তাই নাম ঠিকানা বলতে পারছি না।
- মেহেরুন্নেছা, ২৩/১-এ ডি আই টি প্লট, গেন্ডারিয়া?
- আই এ্যাম রিয়েলি ইমপ্রেসড মিস্টার আহামেদ। সাংবাদিক না হয়ে আপনি গোয়েন্দা হলেও ভাল করতে পারতেন। আপনার কাছে সব ইনফরমেশনই তো আছে। শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন। উড ইউ মাইন্ড ফয়সাল সাহেব?
ভদ্রোচিত ভাবে বিদায়ের ইংগিত পেয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠে ফয়সাল।
- সরি, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দরজার দিকে পা বাড়ায় ফয়সাল। দরজার কাছ থেকে কি ভেবে আবার ফিরে আসে।
- সলিমাবাদে আপনার বাড়িটা খুব সুন্দর, সাজানো গোছানো। অনেক দিন মনে হয় যান না বাড়িতে তাই না? লোকমান আর ফুলি আপনার জন্য দুঃশ্চিন্তায় আছে। সেই যে একদিন সন্ধ্যায় হুট করে বাড়ি গেলেন, আবার পরদিন সকালে কাউকে না জানিয়ে চলে এলেন। ফুলি গেছিল উত্তর পাড়ায় পুকুরে ডুবে মরা দেখতে। আধা ঘন্টা বড়জোর এক ঘন্টা পরে এসে ফুলি দেখল আপনি নাই, পাগলীও নাই। ওদের কাছে ব্যাপারটা কাকতলীয়। কিন্তু আমার কাছে কেন যেন ব্যাপারটা কাকতলীয় মনে হচ্ছে না।
একাধারে ঝানু ব্যবসায়ী আর সেই সাথে দক্ষ অভিনেতা ইসমাঈল দেওয়ান, ফয়সালের শেষ কথা গুলোতে একটু যেন হোঁচট খায়। হলুদ মরিচ হীন তরকারীর মত মুখমন্ডল পান্ডুর বর্ণ ধারণ করে।
- সরি এগেইন। আর বিরক্ত করব না। আসি, গুড লাক মিস্টার দেওয়ান।
ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করে ফয়সাল। পেছন থেকে ডাক আসে- ফয়সাল সাহেব।
পেছন ফিরে তাকায় না ফয়সাল। তবে থমকে দাঁড়ায়, কি বলে শোনার জন্য।
- আমার নতুন পত্রিকার ব্যাপারটা ভুলবেন না। জাস্ট গিভ ইট এ থট। বেতন বা পদের ব্যাপারটা আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করা যাবে, হুম? গুড লাক টু ইউ থু মিস্টার ফয়সাল।

॥দশ॥

বার বার হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে নূরজাহান। দুই ঘন্টার ওপর হলো ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকে ফয়সালের জন্য অপেক্ষা করছে সে। ফয়সালের আসার কথা বারোটায়, আর এখন বাজে দুটো। আজকে ওদের বিবাহ বার্ষিকী। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য সকাল বেলা ঘুম

থেকে উঠে ফয়সালই তাকে দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ উপলক্ষে কোন ভাল রেস্টুরেন্টে সপরিবারে লাঞ্চ করার খায়েশও ব্যক্ত করে সেই সাথে। মনে মনে খুশি হয় নূরী। কিন্তু অভাবের সংসার, তার মধ্যে মেয়েটার অসুখ- এ অবস্থায় রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ করা বিলাসিতার সামিল। ডাক্তার টুনিকে একগাঁদা টেস্ট লিখে দিয়েছে, না করালেই না। কিন্তু ফয়সাল নাছোড় বান্দা। অগত্যা রাজি হয় নূরী। কথা ছিল সকালে মেয়েকে নিয়ে ধানমন্ডির এই ক্লিনিকে টেস্ট গুলি করতে দিয়ে ফয়সালের জন্য অপেক্ষা করবে। সেই মোতাবেক অপেক্ষা করছে সে। কাজের কাজ এখনও কিছুই হয় নাই। এদিকে ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। অনেক ক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে টুনি মিনিট পাঁচেক হলো মায়ের শরীর লেপটে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল থেকে মেয়েটা না খাওয়া। আর অপেক্ষা না করে বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় সে। ঠিক এমন সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে হন্তদন্ত হয়ে কাঁচের দরজা ঠেলে ওয়েটিং লাউঞ্জে প্রবেশ করে ফয়সাল। এত লোকের সামনে কটু কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না নূরী। শুধু অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে- এত দেরি যে?

- থানায় দেরি হয়ে গেল।

- কি বলল ওরা?

- মামলা নিল না। বলল কেরাণীগঞ্জ থানায় মামলা করতে। বাদ দাও ওসব কথা, এদিককার খবর কি? কাজ হইছে?

- না, যে টেস্ট গুলা দিছে তাতে মোটমাট ছয় হাজার টাকার মত লাগবে। আমার কাছে আছে মাত্র পাঁচশ। কমপক্ষে বিশ পার্সেন্ট অগ্রিম না দিলে ওরা—- তোমার কাছে কত আছে?

ফয়সালের গলার আওয়াজে টুনির ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাবাকে দেখে আবদার করে টুনি- বাবা আইসক্রিম খাবো। জীবনে প্রথম বারের মত বাবার কাছে কিছু আবদার করল টুনি।

- এখানে তো আইসক্রিম পাওয়া যায় না মা।

- ঐ যে। তর্জনি দিয়ে দিক নির্দেশ করে টুনি।

কাঁচের দেয়াল ভেদ করে বড় রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার ওপারে, ক্লিনিকের ঠিক উলটো দিকে নতুন একটা আইসক্রিমের দোকান হয়েছে। টুনির তর্জনি সেই দোকানের দিকে।

- আচ্ছা মা ঠিক আছে, আইসক্রিম খাওয়া যাবে। আগে চলো তো ডাক্তারের কাছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা বাবার পিছু নেয় টুনি।

ক্লিনিকের এ্যাডভানস দেওয়ার পর ফয়সালের পকেটে সত্যিকারে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। বাইরে লাঞ্চ করার প্ল্যান আপাতত স্থগিত করতে হয় তাই। পকেটে যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকে রিক্সা ভাড়া বাবদ বিশ টাকা নূরীর হাতে দিয়ে মা মেয়ে দু'জনকে রিক্সায় উঠিয়ে দেয় ফসাল। রিক্সার চাকা ঘোরার মুহূর্তে টুনি তার পুরোনো দাবি উত্থাপন করে- বাবা আইসক্রিম?

এগিয়ে এসে মেয়ের গালে চুমু এঁকে ফয়সাল বলে- মার সাথে বাসায় যাও মামনি, আমি আসার সময় আইসক্রিম নিয়ে আসব, আচ্ছা?

ফয়সালের প্রস্তাবটা টুনির মন মত হয়না। তাই সে প্রত্যুত্তরে হা বা না কিছুই বলে না।

রিক্সা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে হাঁটা শুরু করে ফয়সাল। কিছু টাকার যোগাড় যন্তর করা এখন তার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'য়েক জনের কাছে টাকা সে পায়। কিন্তু টাকা জিনিসটার গতি সম্মুখগামি। এই চিজ একবার এক হাত ছাড়া হলে সেই হাতে ফিরে আসতে কয়েক আলোকবর্ষ লেগে যায়। তারপরও চেষ্টা বলে একটা শব্দ অভিধানে থেকেই যায়।

পর পর দুই জায়গায় হানা দেয় সে। দু'জনেই বেকার। কাজ কাম থাকলে তবু খোঁজার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকে। কিন্তু বেকারের কার- হাজার হাজার। তবে বিফল মনোরথ হয় না সে। রবার্ট ব্রুস ছয়বার ব্যর্থ হওয়ার পরও ভেংগে পড়েনি। সাতবারের মাথায় হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে পেরেছিল। আর তার হয়েছে মাত্র দুইবার। দুই জায়গায় ব্যর্থ হবার পর তৃতীয় জায়গায় হানা দেওয়ার জন্য লালমাটিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ফয়সাল। লালমাটিয়া সি ব্লকের একেকটা আলিশান প্রাসাদের সামনে দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ মনে পড়ে ঈসমাইল দেওয়ানের কথা। ঈসমাইল দেওয়ান সি ব্লকেই থাকে, ১৪৭ নাম্বারে। টাকার চিন্তা আপাতত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে। ১৪৭ নাম্বার বাড়ি খুঁজে পেতে বিলম্ব হয় না। বিশাল লোহার গেটে খাকি ইউনিফর্ম পরা দাঁরোয়ান সালাম ঠুকে বিনয়ের সাথে ফয়সালকে জিজ্ঞেস করে- কার সঙ্গে দেখা করবেন সার?

- আপনার সাহেব, দেওয়ান সাহেব কি অফিস থেকে এসেছেন?
- জ্বীনা, উনি এখনও আসেন নাই।
- উনার মেয়ে- ফারহানা ম্যাডাম কি বাসায় আছে?
- জ্বী আছেন? কিন্তু উনি তো অসুস্থ্য। আপনার পরিচয়?
- আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। উনার বাবাই আমাকে আসতে বলছেন।
- ও আচ্ছা আপনে দাড়ান।

লোহার ফটক থেকে প্রসস্ত একটা রাস্তা বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে মূল দালানের গাড়ি বারান্দায় মিশেছে। সলিমাবাদ গ্রামের দেওয়ান মঞ্জিলের সাথে, লালমাটিয়ার দেওয়ান ভিলার অনেকটা মিল। রাস্তার উভয় পাশে দুব্বা ঘাসের সবুজ গালিচায় রঙবেরঙের পুষ্পের সমাহার। হাতের ডানদিকের বাগানটা আয়তনে বড়। বাগানের ঠিক মাঝখানে সিমেন্টের তৈরী ছাতার মত ছাউনি। ছাউনির নীচে দুজন মহিলা বসে আছে। সামনে তাদের চা এর সরঞ্জাম।। সিনেমায় এধরণের বাড়ি দেখেছে ফয়সাল, কিন্তু বাস্তবে এই প্রথম।

দাঁরোয়ান তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছাউনির দিকে যায়। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যে ছাউনির নীচে বসা দুই রমণীর একজনের নাম ফারহানা।

কাছের মসজিদ থেকে মাগরেবের আজানের ধ্বনিত হয়। খানিক বাদে দাঁরোয়ান ফিরে এসে বলে- যান, আপামনি আপনারে যাইতে বলছে। উই যে উনি বসে আছেন, ছাতার তলে।

সিনেমায় শিল্পপতিদের অট্টালিকা যেমনটা দেখা যায়, এ বাড়িটা হুবহু তাই। তবে একটা জিনিসের অভাব আছে। সেটি এ্যালসেসিয়ান কুকুর। অবশ্যি যে কোন সময় ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসার সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না। বেশ ভয়ে ভয়ে ফুল গাছের কন্টক এড়িয়ে, দুর্বা ঘাস মাড়িয়ে ফয়সাল ছাউনির নীচে এসে দাঁড়ায়। আজান পড়ার সাথে সাথেই দুই রমণীর একজন ছাউনির নীচ থেকে উঠে গেছে। যে বসে আছে তাকে রমণী না বলে তরুনী বলা যায়।

ধনীর আদুরে দুলালীরা দেখতে যেমন হয়, ফারহানা দেখতে ঠিক তার উলটো। চেহারা অথবা পোষাকে উগ্রতার ছাপ নেই। বসরার গোলাপের মত উদ্ভাসিত মুখ, গোলাপি অধর, টিকালো নাক, পদ্ম পাতার মত টানা টানা চোখ, ধবধবে ফর্সা গায়ের রং, ঘন কালো কেশ বাহু আর চেয়ারের হাতল বেয়ে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে। তরুন কবিরা ফারহানার মত প্রেমিকা পেলে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ এক রাতে সাবাড় করে দেবে প্রণয় কবিতা লিখে। তবে ফারহানার চোখের কোনে কালো রেখা সেই সৌন্দর্য্যকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। বোঝা যায় মস্ত বড় একটা ধকল গেছে মেয়েটার ওপর দিয়ে।

প্রথমে ফয়সালই শুরু করে- মিস ফারহানা?
- হ্যা। কিন্তু আপনি? বাবা আপনাকে--- মেয়েটার কণ্ঠ পিয়াসি আখের মত মিষ্টি।
- আমাকে আপনার বাবা পাঠায়নি। আমি ফয়সাল আহামেদ- দৈনিক জনপদ পত্রিকা থেকে এসেছি।
- কিন্তু আমি তো ভাই বিখ্যাত কেউ না। আপনি মনে হয় ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন।
- না আমি ভুল জায়গায় আসিনি। যদি অনুমতি করেন তো একটু বসি?
- হ্যা নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ফারহানার উলটো দিকে বেতের চেয়ার টেনে বসে ফয়সাল।
- আপনার শরীর এখন কেমন ফারহানা?
- জ্বী ভাল। আগের চাইতে অনেক ভাল।
- কিডনি কে ডোনেট করল? আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ?
- নাহ, কিনেছি। কিন্তু আপনি এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ফারহানার পালটা প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে ফয়সাল বলে- কাজটা কি ঠিক হয়েছে বলে মনে করেন?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনা ফারহানা। চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলে- মানে?

- মানে একজন মানুষের শরীরের একটা অংগ আপনি পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। ধরেন আপনার টিভিটা নষ্ট হয়ে গেল। আপনি কি করলেন- স্টেডিয়াম মার্কেটে গিয়ে আরেকটা নতুন টিভি কিনে আনলেন- ব্যাস ঝামেলা শেষ। লাইক ওয়াইজ, আপনার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে- ইউ জাস্ট বট এ্যানাদার ওয়ান, দ্যাট ইজ ইট। ডোন্ট ইউ থিংক ইউ আর ট্রিটিং এ হিউম্যান বডি পার্ট

এ্যাজ এ কমার্সিয়াল গুড?

চোখের কোনে কালো দাগ সত্ত্বেও ফারহানার চোখে মুখে বেশ দৃপ্ত প্রত্যয়ী, দিনের আলোর মত ঝলমলে ভাব দৃশ্যমান ছিল। নিমিষেই যেন সেই ঝলমলে ভাব টুকু দপ করে নিভে যায়। চেনা নাই জানা নাই সাংবাদিক পরিচয় দানকারি এই আগন্তুকটির অযাচিত উপদেশ তার ভেতরে যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু লোকটির এই অযাচিত উপদেশের অন্তরালে যে দর্শন বিদ্যমান, তা সে কোনমতেই অবজ্ঞা করতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যায়। বাগান থেকে খানিকটা দুরে দেওয়ান ভিলার দোতলার বেলকনিতে দাঁড়িয়ে এক পঞ্চাশোর্ধ রমণী এতক্ষণ ওদের দু'জনকে দূর থেকে পর্যবেক্ষন করছিল। হঠাৎ ফয়সাল দোতলার দিকে তাকাতেই মহিলা বেলকনি থেকে সরে যায়।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরবতা ভাংগে ফারহানা।

- ফয়সাল সাহেব, আপনি কখনও নিশ্চিত মৃত্যুর সামনাসামনি হয়েছেন? আমার মনে হয় না হয়েছেন। হলে এ কথা বলতেন না। আমি হয়েছি। একবার না দু দু'বার। খুব ছোট বেলায় একবার মৃত্যুর খুব কাছাকাছি গেছিলাম। আর একবার এই সেদিন, বড় হয়ে। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম আমার দুইটা কিডনিই নষ্ট। সময় বেশি নেই। যে কোন সময় শরীর যন্ত্র কলাপস করতে পারে। ফয়সাল সাহেব আপনি কোনদিন মা পাখিকে তার ছানা পাখির মুখে আহার তুলে দেবার দৃশ্য দেখেছেন? দেখবার মত একটা জিনিস তাই না? আপনি কি নলি বাছুরের দৌঁড় দেখেছেন? সদ্য প্রসূত এক গো সাবক- জন্ম নেওয়ার পরই সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। খুব বেশি সময় লাগে না। উঠে দাঁড়ায়। তারপর পা বাড়ায়, হাঁটু ভেংগে মাটিতে আছড়ে পড়ে। আবার ওঠে, আবার পড়ে। এক বার, দুই বার, কি তিন বার। তারপরই সে দৌঁড় দেয়। তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে গেরস্থের আংগিনা জুড়ে দৌঁড়ায়। কি যে অনাবিল সুন্দর সেই দৃশ্য। আপনি কাঞ্চনজংঘার বরফ চূড়ায় সূর্যোদয় দেখেছেন কখনও? অথবা আমাদের এই বাগানটার কথাই ধরেন। রঙবেরঙের কত না বাহারি ফুল ফুটে আছে। সব ফুলের নাম আপনিও জানেন না, আমিও না। আমি নিশ্চিত এই বাহারি ফুলগুলো দেখতে আপনার ভাল লাগছে। এই মাত্র এক ঝাক নাম না জানা পাখি কিচির মিচির কোরাশ গাইতে গাইতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল- ওই যে দেখা যাচ্ছে দেখেন। কি সুন্দর, না? কই কথা বলছেন না কেন ফয়সাল সাহেব।

- হ্যা সুন্দর। অস্ফুট উত্তর দেয় ফয়সাল।

- আপনাকে এই মুহূর্তে কেউ একজন বলল, এ্যাজ অব টুমরো ইউ আর এ ডেড ম্যান। আজকের পর থেকে আপনি আর পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করতে পারবেন না। আপনার চারদিকে যা কিছু সুন্দর আছে- মা পাখির খাবার তুলে দেওয়া, নলি বাছুরের দৌঁড়, কাঞ্চনজংঘার সূর্যোদয়, বাহারি ফুল, পখিদের ডানা মেলে ওড়া, আপনার মায়ের শরীরের গন্ধ, বাবার স্নেহ আলিঙ্গন, স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তানের মমতামাখা বাবা ডাক, আরও শত সহস্র সুন্দর আর ভাল লাগার এই জগৎ ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে অন্য এক জগতে। সেখানে আপনার জন্য কি অপেক্ষা করছে আপনি তা জানেন না। ফয়সাল সাহেব, আপনাকে আপনার মৃত্যু পরোয়ানার কথা বললাম, আপনি শুনলেন। ইটস ওনলি এ হাইপোথিসিস। কিন্তু আমাকে যখন আমার মৃত্যু পরোয়ানার কথা বলা হয়েছিল, তখন সেটা ছিল রিয়্যাল। জাস্ট থিংক এ্যাবাউট ইট। আমার বাবার কোটি কোটি টাকা, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, বড়লোক আর ক্ষমতাধর সব আত্মীয় স্বজন- কোন কিছুই কাজে লাগছে না। আমি মরতে যাচ্ছি। এত টাকা আর ক্ষমতা থাকতেও আমার বাবা তার আদরের মেয়েকে বাঁচাতে পারছে না। এমন সময় এক মহিলা কিডনি বিক্রি করতে চাইলেন। উনি আমার আত্মীয় স্বজন কেউ না। তবু ফর্চুনেটলি আমার সঙ্গে উনার ক্লিনিকাল ব্যাপারগুলি ম্যাচ করে গেল। মহিলার দরকার টাকার, আর আমার দরকার—– মৃত্যুপথযাত্রী আমি। ন্যায় অন্যায়, মানবিক, অমানবিক এসব ভাবার অবসর আমার কোথায়?

ফারহানার মানবিক আবেদনময়ী আত্মপক্ষ সমর্থন ফয়সালের ভেতরটাকে স্পর্শ করে যায়। সম্মুখে উপবিষ্টা, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরে আসা, আবেগাপ্লুত এই যুবতীকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পায় না সে। কিন্তু ফারহানার প্রতি সহানুভুতির সাথে সাথে আরেকজন হতভাগ্য মানবীর মৃত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার। কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর কথা বলে ফয়সাল।

- ফারাহানা, আপনি কি আপনার ডোনার, মানে যার কিডনি এখন আপনার শরীরে তাকে দেখেছেন?
- না। এখনও দেখার সুযোগ হয়নি। হাসপাতাল থেকে আসার পরই আমি যেতে চেয়েছি। কিন্তু মহিলা থাকেন গেন্ডারিয়ায়। ওখানকার রাস্তা নাকি কাটা। এই মুহূর্তে হেঁটে যাওয়া, মানে বুঝতেই তো পারছেন। তবে দু'একদিনের মধ্যেই যাবো।
- ওয়েল ফারহানা এতক্ষণ আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা বললেন তার সাথে আমি পুরোপুরি একমত। তবে আমি বুঝতে পারছিনা আপনার আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত নাকি লোক দেখানো। এনি ওয়ে যে কারণে আমি এসেছি তা এবার বলছি। যে কিডনি বর্তমানে আপনার শরীরে আছে, তা কেনা হয়নি। একজনের শরীর থেকে তার অজ্ঞাতসারে জিনিসটা অপসারন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আপনাকে সুন্দর আর ভাল লাগার এই পৃথিবীতে রেখে সে নিজে চলে গেছে অজানা পৃথিবীতে।
এবারে ফস করে জ্বলে ওঠে ফারহানা- ফয়সাল সাহেব, এতক্ষণ ভদ্রতা করে আপনাকে কিছু বলিনি। কিন্তু এভরিথিং সুড হ্যাভ এ লিমিট। আপনিও সেই লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি আদৌ কোন সাংবাদিক কি না। বাবার অনেক শত্রু আছে জানি। আপনি নিশ্চয়ই সেই শত্রু পক্ষের কেউ। ইচ্ছা করলে পুলিশ ডেকে আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনাকে দেখে গুন্ডা পান্ডা প্রকৃতির মনে হচ্ছে না। পুলিশি ঝামেলায় না গিয়ে আপনাকে ভদ্র ভাবে অনুরোধ করছি, আপনি চলে যান এখান থেকে।
- আই এ্যাম সরি ফারহানা। অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য। আপনাদের গ্রামের পাগলীর, মানে খোরা পাগলনির কিডনি লাগানো হয়েছে আপনার শরীরে। পাগলি ইজ নো লঙ্গার ইন দিস আর্থ।
বুক পকেট থাকে ছবিটা বের করে টেবিলের ওপর রাখে ফয়সাল।
- এই ছবিটা আমি মর্গ থেকে তুলেছি। পাগলির মৃত দেহের ছবি। কি চিনতে পারছেন?
টেবিলের ছবিটার দিকে এক পলকের জন্য তাকায় ফারহানা। পরমুহূর্তেই ছবি থেকে চোখ সরিয়ে করুণ দৃষ্টিতে ফয়সালের দিকে তাকায়। যে চোখে একটু আগেও রাগ আর ঘৃনার আগুন জ্বলছিল, সেই চোখে এখন রাজ্যের বিস্ময়। গোধুলী বেলার বিদায়ী রক্তিম আলোয় ফারহানার বিস্ময় ভরা করুণ মুখখানি এখন অনেক পবিত্র, অনেক মায়াবি মনে হয় ফয়সালের কাছে।
টাকার যোগাড় করে ঘরে ফিরতে গভীর রাত হয় ফয়সালের। যাদের কাছে পাওনা তাদের কাছ থেকে এক পয়সাও মেলেনি। জহিরুলের কাছ থেকে ধার হিসেবে তিন হাজার টাকা পেয়েছে সে। ঘরে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হয় আইসক্রিমের কথা। প্রথমবারের মত মেয়েটা তার কাছে কিছু চেয়েছে। খুব সামান্য- আইসক্রিম। কিন্তু টাকার অভাবে মেয়েটার সেই চাওয়া পূরণ করা হয়ে ওঠেনি। হৃৎপিন্ডের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে ওঠে তার।

॥এগার॥

জুন মাসের এগার তারিখ, বুধবার। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, কিন্তু বাতাসে গুমোট ভাব ঠিকই আছে। দৈনিক জনপদের অফিস ভবনটি বহুতলবিশিষ্ট হলেও পত্রিকার কার্যক্রম নীচতলা আর দোতলাতেই সীমাবদ্ধ। ফয়সালের বসবার জায়গাটি দোতলার এক কোনায়, জানালার পাশে। নিজ আসনে বসে ইরাক যুদ্ধের ওপর একটা লেখা লিখছিল সে। পুরো যুদ্ধের সময় বা বুশের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষনার পরও ফয়সাল যুদ্ধ নিয়ে কোন লেখা লেখেনি। কি লাভ? চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। সারা পৃথিবীর সভ্য মানুষ গুলোর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে দু'জন জংলি জানোয়ার সভ্যতাকে উপর্যুপরি ধর্ষন করে যাচ্ছে। তবে ইদানিং বুশ ব্লেয়ারের ঘুম হারাম। প্রতিদিনই ইরাকে তথা কথিত শান্তি (জংলি) বাহিনী গেরিলা হামলার শীকার হচ্ছে। এ অবস্থায় মার্কিনী আর বৃটিশরা চাইবে ইরাকে একটা বহুজাতিক শান্তি বাহিনী নিয়োগ দিয়ে নিজেদের সৈন্য সামন্তর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কাজেই খুব শীগগিরই যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ (?) আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করাই ফয়সালের এই মুহূর্তে কলম ধরার মূল উদ্দেশ্য। তবে লিখতে বসে ক্ষণে ক্ষণে তাল হারিয়ে ফেলছে সে। মনটা ভাল নেই। টুনির যাবতীয় রিপোর্ট দেখে ডাক্তার খুব একটা আশার কথা শোনায়নি। মুখে এখনও কিছু বলেনি, কিন্তু আকারে ইংগিতে বলতে চেয়েছে

যে টুনির অসুখটা ভয়াবহ। যদি শেষ পর্যন্ত সিংগাপোর বা ইন্ডিয়ায় নিয়ে যেতে হয় তবে অনেক টাকার দরকার। এত টাকা জোগাড় করা তার মত ছাপোষা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

পাগলি হত্যার ব্যাপারে রমণা থানায় শেষ তক মামলা নিয়েছে। হাওয়া এখন উলটো দিক থেকে জোরে সোরে বইতে শুরু করেছে। এ সংক্রান্ত একটা সরেজমিন রিপোর্ট ফ্রন্ট পেইজে লীড নিউজ হিসেবে ছাপার জন্য সরাসরি এডিটরের হাতে তুলে দিয়েছিল ফয়সাল। কিন্তু সংবাদটা ফ্রন্ট পেইজে তো ছাপা হয়ইনি, বরং মূল লেখাটার অর্ধেকের মত কাট ছাট করে ভেতরের পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে। বাশার সাহেবের মত মানুষের কাছ থেকে এরকমটা আশা করেনি সে। সংবাদটা দেখের সাথে সাথে আবুল বাশারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু ভদ্রলোক তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত। এ ঘটনার যবনিকা কোথায় কিভাবে হয় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ফয়সাল। তবে হাল ছেড়ে দেয়নি সে। এসব দুঃশ্চিন্তার কারণে কম্পিউটারের কি বোর্ডে বার বার হাত থমকে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় ফয়সাল। সকাল থেকে রোদ নেই এক রত্তি। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ দল বেঁধে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। ক্ষণে ক্ষণে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ, যুদ্ধের দামামা। শুধু তর্জন গর্জন না, এ মেঘ হয়ত বর্ষন অবধি গড়াবে। মেঘলা আকাশ থেকে জমিনে দৃষ্টি ঘোরায় ফয়সাল।

মতিঝিলের ব্যস্ত সড়ক। প্রতিদিনের মতই পায়ে হাঁটা ব্যস্ত পথচারী, চোর বাটপাড়, সাধু সন্নাসী, রিক্সার ক্রিং ক্রিং ঘন্টা, যাত্রী বোঝাই বাস, কান ফাঁটানো হর্ন, কালো ধোঁয়া। জনপদ ভবনের ডানপাশের ফুটপাত ঘেঁষে ছোট একটা টঙ্গের মত চায়ের দোকান। মকবুলের চায়ের স্টল। দোকানটাতে সকাল সন্ধ্যা ভিড় লেগেই থাকে। চা স্টলের পাশে একটা মোটর সাইকেল দাঁড় করানো। মোটর বাইকের যুবক বয়সি আরোহী দু'জন ফুটপাতে পায়চারী করছে আর ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছে। যুবক দু'জনেরেই পরনে কালো টি শার্ট, কালো প্যান্ট, চোখে ডার্ক সান গ্লাস। এই তীব্র গরমেও কালো পোষাক, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। যুবকদ্বয়ের অস্বাভাবিক পোষাক আর আচরণের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আবার কি বোর্ডে আঙ্গুল চালায় সে। টেলিফোনটা বেজে ওঠে সেই মুহূর্তে।

– হ্যালো ফয়সাল? ভীত সন্ত্রস্থ নারী কণ্ঠ। কণ্ঠটা নূরজাহানের।

– হ্যা, নূরী? ফয়সাল বলছি। কি ব্যাপার, কই থেকে ফোন করছ? তোমার গলার আওয়াজ––

– গলির মোড়ের ফার্মেসী থেকে। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে টুনির মাথাটা ফেটে গেছে। গল গল করে রক্ত পড়তেছিল এতক্ষণ। এখন অবশ্য রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। ফার্মেসীর উনারা বলছে হসপিটালে নিতে, সেলাই লাগবে। আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারতেছি না। নূরজাহানের কণ্ঠে ভিতির ছাপ।

– তুমি ঐখানেই থাকো, আমি এখনই আসছি, ঠিক আছে? ফোন নামিয়ে রেখে অতি দ্রুত রাস্তায় নেমে আসে ফয়সাল।

দীর্ঘ নয় মাস পর ঢাকা শহরের রাস্তায় প্রকাশ্যে পায়চারী করতে বেশ ভাল লাগছে মতির। ঢাকা শহরে মাঝারি গোছের একটা গ্যাং চালায় মতি। গ্যাংয়ের নাম বাস্টার্ড গ্যাং। ঢাকা শহরের আর দশজন তারকা মাস্তানদের মত মতির উত্থান কোন মফঃস্বল শহর থেকে হয় নাই। খোদ ঢাকা শহরেই তার জন্ম, আগারগাঁও বস্তিতে। এখন অবশ্য এই বস্তির নাম বিএনপি বস্তি। গর্ভধারিণীর কথা খুব আবছা আবছা মনে পড়ে মতির, কিন্তু জন্মদাতার কথা আদৌ মনে পড়ে না তার। আসলে বাপ পদবির মানুষটির কোন অস্তিত্ব তার জীবনে কখনই ছিল না। আশির দশকের শেষের দিকে এফ রহমান হলের ক্যান্টিন বয়ের কাজ করত মতি। সেখান থেকেই তার মাস্তানির হাতে খড়ি। সে সময় ছাত্র নেতারা তাকে ডাকত জাউরা মতি বলে। এফ রহমান হলের ক্যান্টিন বয় পাতি মাস্তান মতি এখন ঢাকা শহরের প্রথম দশজন ডাকসাইটে মাস্তানদের মধ্যে একজন। বাংলাদেশ সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় তার স্থান নয় নম্বরে- মস্তকের দাম ধরা হয়েছেপঞ্চাশ হাজার টাকা- জীবিত অথবা মৃত। এর আগে তিন তিন বার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও, সুখের বিষয় এই যে পুলিশের কাছে মতির কোন ছবি নাই। গত বছর সারা দেশে যৌথ অভিযান শুরু হওয়ার আগেই খবরটা পেয়ে যায় মতি। শুধু মতি না এই পেশায় প্রতিথযশা যারা আছে তারা সবাই আগে ভাগে খবর পেয়ে নিরাপদ স্থানে সটকে পড়েছিল। অভিযানে ধরা পড়েছে কিছু পাতি মাস্তান, মারাও গেছে বেশ কিছু। তবে মতি বা তার মত কেউই ধরা বা মারা পড়েনি। *রাখে পুলিশ মারে কে?* আজকে দীর্ঘ দিন পর অপারেশনে এসেছে মতি। কাজটা অতি

ক্ষুদ্র- সামান্য একজন সাংবাদিকের হাড়গোড় ভাঙ্গার কাজ। প্রাণে মারা নিষেধ আছে। সামান্য একজন সাংবাদিক পেটানোর জন্য এত আয়োজন- ব্যাপারটা একটু হাস্যকর। অফিসের ভেতর ঢুকে কান যেতে দুইটা চড় মারলে শালায় হেগে মুতে কাপড় নষ্ট করে ফেলবে। আর পরদিন থেকে ব্যাটা লেখালেখি তো দূরে থাক, ফুটপাতে বসে দলিল টাইপ করা কি চটি বই বিক্রি করার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখাবে না।

সাাংবাদিকদের কাজই হচ্ছে মানুষের নামে উলটাপালটা লেখা। প্রায় সময়ই এসব উলটাপালটা লেখায় আখেরে ভাল ফল দেয়। মতি তার নিজেকে দিয়েই প্রমান পেয়েছে বহুবার। গত এক দশকে ঢাকা শহরে একশটা খুন হয়ে থাকলে তার নব্বইটার মধ্যেই মতির নামটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এসে গেছে সাংবাদিক ভাইদের কল্যাণে। একবার করে পত্রিকায় নাম আসে, আর আগের চেয়ে দশ গুণ দাপোট বেড়ে যায় তার। গেল বছর যৌথ অভিযানের সময় পত্রিকা ওয়ালারা ঢালাও করে ছাপা শুরু করল যে জাউরা মতি সহ আরও তিন জন শীর্ষ সন্ত্রাসী নাকি কোলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। অন্যদের কথা নিশ্চিত করে না বলতে পারলেও নিজের কথা নিজে নিশ্চিত করে বলতে পারে মতি। কোলকাতা তো দূরের কথা এই ঢাকা শহরের চৌহদ্দির বাইরে সে বিগত এক বছরে পা রাখেনি। অবশ্য অপপ্রচারটা তার লুকিয়ে থাকা অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল। সব মিলিয়েই পুলিশ আর সাংবাদিকদের প্রতি জাউরা মতির যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। তাছাড়া হাড়গোড় ভাঙ্গার কাজটা তার কাছে খুবই অমানবিক মনে হয়। একটা মানুষকে সারা জীবন পঙ্গু করে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ। এর চেয়ে গোটা দুই বুলেট খরচ করলেই ঝামেলে চুকে বুকে যায়। এধরণের কাজ প্রথম জীবনে সেই এফ রহমান হলে থাকতে করেছে সে। রাজধানীর সব ক'টি থানা মিলে মোট সতেরটি খুনের মামলা আছে তার বিরুদ্ধে। তবে কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে সামান্য হাড় গোড় ভাঙ্গার কাজ এমনকি খুনখারাবির কাজেও সে সরাসরি অংশ নেয় না। জাউরা মতির মোবাইল ফোনের একটা কলই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কাজটার সুপারি যে দিয়েছে তার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে উপস্থিত থেকে কাজটা সম্পূর্ণ করতে চায় মতি। সাংবাদিক বেচারা কি না কি লিখেছে কে জানে? লিখলেই বা কি? জনপদের মত বি ক্লাশ পত্রিকার সি ক্লাশ একজন সাংবাদিক একটু আধটু লিখলে দেওয়ান সাহেবের মত লোকের কেশাগ্রে সামান্য বাতাসও লাগার কথা না। সে যাই হোক সাংবাদিক ব্যাটার কপাল খারাপ। ললাটের লিখন না যায় খন্ডন।

ফয়সালকে অসময়ে তড়িঘড়ি করে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে পায়চারী থামায় মতি। সহযোগী 'খাটাস দুলাল'কে ইশারায় মোটর সাইকেল স্টার্ট দিতে বলে মোবাইল ফোন হাতে তুলে নেয় সে। ফয়সালের রিক্সা বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মতির বাইকের চাকা ঘোরে। টুপ টাপ এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে ততক্ষণে। যে কোন সময় ঝুপ ঝুপ নেমে পড়তে পারে।

- ছার পর্দা দিমু? চলন্ত অবস্থায় ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে রিক্সাচালক।

- নাহ, দরকার নাই, আপনে চালান। একটু জলদি চালান ভাই। ফয়সালের রিক্সা শাপলা চত্বর ঘুরে কমলাপুরের দিকে চলতে থাকে। শাপলা চত্বর থেকে একজোড়া মোটর বাইক আগের বাইকটির সাথে যোগ দেয়। প্রতিটি বাইকে দু'জন করে যুবারোহী। কিছুটা আগ পিছ করে বাইক তিনটি ফয়সালের রিক্সার পিছু পিছু এগুতে থাকে।

শৈশব থেকেই বৃষ্টিতে ভেজার একটা প্রবল শখ ফয়সালের ছিল। এমনকি বিয়ের পর নতুন নতুন নূরীকে নিয়ে অনেকবার বৃষ্টিতে ভিজেছে সে। বড্ড রোমান্টিক ছিল বৃষ্টিতে ভেজার সেই মুহূর্ত গুলো। খুব বেশি দিন আগের কথা না। মাত্র দুই তিন বছরের ব্যবধানে সব রোমান্টিকতা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ঢাকা শহর সেদিনও আজকের মতই লোকে লোকারণ্য ছিল। রাজপথে ছিল রিক্সার ক্রিং ক্রিং, স্কুটার, বাস, মিনিবাসের প্যাঁ পুঁ হর্ণ, কালো ধোঁয়া, হাকডাক, খিস্তি খেউর। একই রাজপথে সন্ত্রাসের কালো থাবা, রাজনীতিবিদদের মিথ্যা ভাষন, মিছিল মিটিং পিকেটিং- অসহায় জিম্মি সাধারণ মানুষ, আজকের মতই। সেদিনও সংসারে ঝুট ঝামেলা ছিল, আজও আছে। ছিল ঝগড়া বিবাদ, মান অভিমান, অভাব অনটন, চাওয়া পাওয়া, নিত্য দিনের টানাপোড়েন, হুবহু আজকের মতই। এতকিছুর মাঝেও হাসি ঠাট্টা, আনন্দ উল্লাস, ভালবাসা- সব, সব কিছুই ঠিক ঠাক চলত। সেদিনও জোৎস্না রাতে আকাশে তারাদের মেলা বসত। মেলা

থেকে সব গুলো তারা ধরে এনে একে একে বিনি সুতার মালা গেঁথে পরিয়ে দিত প্রেমিকা তার প্রেমিকের গলায়। আজকের মতই আষাঢ়ের প্রথম লগনে কালো আকাশের বুক চিঁড়ে জলধারা অঝোরে ঝরে পড়ত। ন্যাংটা ছেলে পুলের দল রৈ রৈ করে পানি আর কাঁদায় দাপাদাপি করত। সদ্য কলেজে ওঠা প্রেমিক প্রেমিকা যুগল অনেক কষ্টে পার্কের ঝোঁপ ঝাঁড়ের আড়ালে, গাছের তলায় জড়াজড়ি করে ধরে কোন মতে বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে নিজেদের রক্ষার বৃথা চেষ্টা করত। ভিজতে যে মন চাইত না তা নয়। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেই চাওয়া না পাওয়াতেই পরিসমাপ্তি ঘটত। জড়িয়ে ধরার অনুভূতি টুকু শুধু থাকত সম্বল হয়ে। নব দম্পতিরা বাড়িওয়ালার হুমকি ধামকি, মুরুব্বিদের চোখ রাঙ্গানি, পাড়া প্রতিবেশীদের কটাক্ষ এসবের তোয়াক্কা না করে বাড়ির ছাদে মনের সুখে বৃষ্টি স্নান করত।

সেই ছেলে পুলের দল হয়ত আজও বৃষ্টিতে ভেঁজে, তবে ন্যাংটা হয়ে কাঁদায় দাপাদাপি করায় তারা আর কোন আনন্দ খুঁজে পায় না। ওদের স্থান দখল করে নিয়েছে অন্য এক দল ছেলে পুলে। সেই প্রেমিক প্রেমিকা যুগল এখন আর নিজেদের আড়াল করে না। জড়িয়ে ধরার স্মৃতি নিয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। সেই ঝোপ ঝাঁড় এখনও আছে, স্থানও অভিন্ন শুধু মানুষগুলো ভিন্ন। দোতলা কি তিন তলা বাড়ির ছাদে সব বাঁধা বিপত্তি একপাশে ঠেলে দিয়ে নবদম্পতিরা এখনও সুযোগ পেলেই আষাঢ়ের প্রথম বর্ষনে স্নানের আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না। তবে সেদিনের সেই জায়া ও পতি- ফয়সাল আর নূরী এখন আর বৃষ্টি স্নান করে না। আষাঢ় মাস ওদের জীবনে নতুন কোন বার্তা বয়ে আনে না। বৃষ্টি ভেজা সেই ক্ষণ গুলো এখন শুধুই সোনালী অতীত।

ফয়সাল বা নূরীর বর্তমান চাওয়া পাওয়া, আশা আকাংখা,সুখ সাচ্ছন্দ, ভাললাগা বা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখা এর সবই ছোট্ট টুনটুনি কেন্দ্রিক। মেয়েটার কি অসুখ হয়েছে তা এখনও নিশ্চিত না। তবে ডাক্তার আকার ইঙ্গিতে বলেছে ব্লাড ক্যান্সারের কথা। ‘ক্যান্সার’ শব্দটা শুনলেই কেমন যেন গা ছমছম করে, বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে ওঠে, শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে ভিন্ন রুপ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। শত সহস্র বার ফিরে ফিরে ধ্বনিত হয়- মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। জগৎ সংসারে অবধারিত সত্য হচ্ছে মৃত্যু। যে যায়, সে তো চলেই যায়, সত্যকে মেনে নিয়ে। কিন্তু আপনজনদের কাছে সেই সত্যটা বড্ড নির্মম, নির্দয়, নিষ্ঠুর। টুনটুনি যে ফয়সালের প্রাণ, আত্মা, শরীরের অবিচ্ছেদ্দ অংশ। আত্মা ছাড়া মানুষ বাঁচে কিভাবে? টুনটুনিকে সে মরতে দেবে না। যার কাছে নিয়ে যেতে হয়, যেখানে নিয়ে যেতে হয়, যত টাকা- - -

ক্যারর র র শব্দ করে চলন্ত রিক্সার সামনে এসে একটা মোটর সাইকেল ব্রেক কষে। ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসে ফয়সাল। মোটর আরোহী যুবক দু’জনকে চিনতে পারে সে। সকাল থেকেই অফিসের জানালা দিয়ে মকবুলের চা স্টলের পাশে এই দু’জনকেই দেখেছে সে। এভাবে হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করতে চায় ফয়সাল। কিন্তু কেন্দ্রিয় স্নায়ু তন্ত্র থেকে হিম শীতল একটা অনুভূতি শিরদাঁড়া বেঁয়ে পায়ের পাতায় এসে থেমে যায়। সমস্ত শরীর যেন হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অন্য দুই মোটর সাইকেল ইতমধ্যে রিক্সার দুই পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন এসে ফয়সালের কলার ধরে ঝামটা টান মারে। বাঁধা দিতে পারে না ফয়সাল। রিক্সায় বসা অবস্থা থেকে সরাসরি পিচ ঢালা রাজপথে আঁছড়ে পড়ে। ঝপ ঝপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয় সেই মুহূর্তে। রাস্তায় শোয়া অবস্থায় অসহায় আর অবাক দৃষ্টিতে চারপাশ ঘিরে দাঁড়ানো ছয় যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকে ফয়সাল।

ওরা যেন এ গ্রহের কোন মানুষ না। ভিন গ্রহের এলিয়েন। লোহার রড হাতে এগিয়ে আসে এক এলিয়েন। ডান হাতের কব্জি বরাবর সজোরে আঘাত করে ধাতব দন্ডটি দিয়ে। গগন ফাঁটানো চিৎকার দিয়ে ওঠে ফয়সাল। হুস হাস ছুটে চলা প্রাইভেট কারের জানালার কাঁচ নামিয়ে ভেতরের আরোহিরা ঘটনাটা আঁচ করার চেষ্টা করে। নিজে এবং নিজের গাড়ি এখনও অক্ষত আছে দেখে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে লোকগুলো, সেই সাথে ড্রাইভারকে হাঁক দিয়ে বলে- ড্রাইভার গাড়ি জোরসে চালাও।

এইমাত্র ক্লিনিক থেকে রিক্সায় ফেরা গর্ভবতী স্ত্রী তার স্বামীকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। সন্তানকে নিয়ে স্কুল ফেরত জননী তার সন্তানের চোখ হাতের তালু দিয়ে ঢেকে ফেলে। গৃহাভিমুখে ধাবমান অফিস ফেরত যাত্রীরা বাস মিনিবাসের লক্কড় ঝক্কড় জানালা দিয়ে কচ্ছপের মত বাইরে গলা বাড়িয়ে দেখতে চায় ‘গটনাডা কি’। কিন্তু গতির কারণে মজার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার আনন্দ

থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সেদিক থকে ভাগ্যবান পায়ে হাঁটা মানুষগুলো। বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও, মুফতে এত সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করার লোভ সামলাতে পারে না। শুধু চোখের দেখায় দোষের কিছু নেই, শুনলে দোষ। তাই ওরা শোনে না। ফয়সালের ত্রাহি চিৎকার বাষ্প হয়ে শূণ্যে মিলিয়ে যায়।

একের পর এক আঘাত আসছে। প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা নেই ফয়সালের। হাত পায়ের হাড় গুলো কাঁচের মত চূর্ন বিচুর্ন হয়ে গেছে। রক্তাক্ত সারা শরীর। তারপরও আঘাত আসতে থাকে। কোন বাঁধা নেই, শুধুই চিৎকার। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে জগতটা। ভিন গ্রহের মানুষগুলো তাকে যেন কি বলছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পায়না, হয়তবা বুঝতেও পারে না ফয়সাল। অন্য গ্রহের ভাষা যে সে পড়তে জানে না। লোকগুলো খামোখাই তাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। বুকের জমিনে ক্ষরা, কণ্ঠনালী শুষ্ক মরু, জগৎ জোড়া অন্ধকার। এত শীগগির আঁধার নেমে আসল কেন? খানিক আগেই তো ধবধবে দিনের আলো ছিল। তবে কি সে মারা যাচ্ছে? দূ উ রে কোথা থেকে যেন শব্দ ভেসে আসছে, হুইসেলের শব্দ। খেলা শেষের হুইসেল? নাকি মাস্টারের সেই ফিরতি ট্রেনের হুইসেল? কিন্তু এখনই ফিরে যেতে সে চায় না। আর চাইলেই কি ফেরা যায়? এখনও অনেক কাজ যে বাকি। কি কাজ, কি কাজ যেন বাকি? ধুর ছাই মনে পড়ছে না। একটু একটু ভাসা ভাসা, আবছা মনে পড়ছে। মৃত দেহ, কিডনি, জটা ধরা চুল, এক জোড়া মায়াবি চোখ, হাতে মাটির খোরা। বিড়বিড় করে আবার যেন কি বলছে মৃত দেহ। উফ এতক্ষণে মনে পড়ল। খোরা পাগলনি- খোরা পাগলনি আমি তোমার কথা ভুলিনি। মৃত্যুর আগে তুমি সুবিচার পাওনি, মৃত্যুর পর পাবে। তুমিতো আল্লাহ বিশ্বাস কর তাইনা, আমিও করি। ইছু বিছু দুরিন্নাছ– - - খান্নাছ, খান্নাছ। পাবে তুমি নিশ্চয়ই সুবিচার পাবে। আবার সেই শব্দ, হুইসেলের শব্দ। খেলা শেষের হুইসেল, ফিরতি ট্রেনের হুইসেল। উ হুম, আমি যাবো না, এখন যাবো না। আমার যে অনেক কাজ বাকি। আমাদের কন্যা, একমাত্র আদরের কন্যা টুনির অসুখ, কঠিন অসুখ। চিকিৎসা করতে অনেক টাকা লাগবে। টাকা চাই অনেক টাকা। এর মধ্যে আবার মাথা ফাটিয়ে বসে আছে। আহারে কত কষ্টই না হচ্ছে মেয়েটার। মারে, আমাকে মাফ কর মা। আমি তোকে সেদিন আইসক্রিম কিনে দিতে পারি নাই। জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কিছু চাইলি তুই, আর আমি কি না- - - লক্ষ্মী মা আমার, কাঁদে না, ব্যথা করছে? অনেক ব্যথা? আহারে কাঁদে না সোনা, কাঁদে না। আ আ - - মি, আমি আ ই ই স ক্রি- -

বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আমার। বুকের ছাতি যেন ফেঁটে যেতে চাইছে। পানি একটু পানি। ছপ ছপ ছপ ছপ- বৃষ্টি ভেজা ধরনীতে মানুষের পদ শব্দ। বৃষ্টি বৃষ্টি- ও হ্যা তাইতো এখনতো বৃষ্টি পড়ছে। আষাঢ়ের পয়লা বৃষ্টি, আগের মতই। পানি পানি চারিদিকে শুধু পানি। পা আ নি কোথায়- এযে রক্ত, রক্তের বন্যা। রক্তের লাল গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছে সে , তলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সে, অন্ধকারের অতল গহব্বরে।। অন্ধকার, অন্ধকার- ঘুটঘুটে, নিঝুম, গ হ অ ন অন্ধকার।

॥বার॥

অন্ধকার নামার সাথে সাথে হুইসেলের শব্দও থেমে যায়। সব শান্ত, নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা, অখন্ড মৌনতা। সেই মৌনতার পালাও শেষ হয় একসময়। আঁধারের বুক চিরে খন্ড খন্ড, ঝাপসা আলোর আবির্ভাব ঘটে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে প্রিয় মুখ, প্রিয় কণ্ঠ, অন্ধকার - - ঝাপসা আলো, প্রিয় ডাক, জুতোর মচমচ, হিলের খট খট, ওষুধের গন্ধ, অন্ধকার - - ক্ষীণ আলো, পরিচিত মুখ, অপরিচিত কণ্ঠ, প্রিয় গন্ধ, বহু কালের চেনা স্পর্শ - - আবার অন্ধকার।

হসপিটালের বেডের পাশে চেয়ারে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছিল নূরী। আজকে দিয়ে টানা তিন দিন চলছে। এর মধ্যে একবারও বাসায় যায়নি সে। টুনি এ ক'দিন নানির বাড়িতে আছে। প্রতি দিনই আসে একবার করে, বাবাকে দেখতে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, শুভাকাংখি, ফয়সালের অফিসের সহকর্মী অনেকেই ইতমধ্যে এসেছে। নূরীকে তারা বারবার অনুরোধ করেছে বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে। কিন্তু নূরীর এক কথা- জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সে কোথাও যাবে না। আসলে এতদিন সে বুঝতে পারেনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা, হাসপাতালের বিছানায় শায়িত মানুষটা তার কতটা আপন ছিল। কত সুখ, কত দুঃখ, কত ভাললাগা ভালবাসা, কত মান অভিমান, কত

অম্ল মধুর বেদনার স্মৃতি এই মানুষটিকে ঘিরে। গত তিন দিন ফয়সালের শিয়রের পাশে বসে বসে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেছে সে। আর দু'হাত তুলে আল্লাহ পাকের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, অতি আপনজনের প্রাণ ভিক্ষা।

দুপুরের খাবারের পালা শেষ। ভিজিটিং আওয়ার আসতে এখনও অনেক দেরি। এসময়টা বেশ নিরিবিলি। নার্সদের হিলের খট খট আর ডাক্তারদের জুতোর মচ মচ শব্দ নেই, বারান্দায় আয়া, খানসামা, মেথরদের চিৎকার চেচামেচি নেই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তন্দ্রা মত এসেছিল নূরী। রোগীর বিছানা থেকে খচমচ নড়াচড়ার শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় সে।

দ'ুচোখ মেলে তাকিয়ে আছে ফয়সাল। ফয়সালের শিয়রের কাছে এসে মাথায় হাত রাখে নূরী। কোন কথা বলতে পারে না ফয়সাল। আবেশে আবার চোখ বুজে আসছে তার। নূরীর হাত কপাল থেকে গালে নেমে এসেছে। বড় করে নিঃশ্বাস নেয় ফয়সাল। এই হাতের ছোঁয়া আর ঘ্রান কত যুগ পরে যেন পেল সে। ভাললাগার স্বর্গীয় আনন্দে ফয়সালের দু'চোখের পাতা বুজে আসে। বন্ধ চোখের পাতার এক কোনা থেকে কয়েক ফোঁটা নোনা পানি নিঃশব্দে কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ভিজিটিং আওয়ারে দর্শনার্থী আসতে থাকে। রক্তের সম্পর্কের আপনজন বলতে তেমন কেউ নেই ফয়সালের। মা বাবা গত হয়েছেন অনেক আগেই। ছোট এক বোন আছে। বর্তমানে স্বামীর সাথে ইটালি থাকে। রক্তের সম্পর্কের কেউ না থাকলেও শশুর বাড়ির পক্ষের আত্মীয় স্বজন আছে। তাছাড়া তার নিজস্ব পরিচিতির গন্ডিও বেশ বড়। একে একে অনেকেই আসে। ফয়সালের কপালে হাত রাখে, পাশে বসে, কুশল জিজ্ঞেস করে, শান্তনা দেয়। কাছের দূরের সবাইকেই খুব আপন মনে হয় তার কাছে। ভাল লাগে ফয়সালের, খুব ভাল লাগে। প্রিয়ার উৎকণ্ঠা দেখতে ভাল লাগে,দূর বা নিকট আত্মীয়ের অথবা সহকর্মীর আশ্বাস বাণী ভাল লাগে, ওষুধের গন্ধ ভাল লাগে, হাসপাতালের কেবিনের রং ওঠা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে, ফ্যানের বাতাসে দরজা জানালার পর্দার খচমচ নড়াচড়া দেখতে ভাল লাগে, বুক ভরে শ্বাস নিতে ভাল লাগে। এর সবই তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় - সে বেঁচে আছে। ধরণীতে বেঁচে থাকার মত নির্ভেজাল আনন্দের বুঝি আর কোন সমান্তরাল অস্তিত্ব হয় না।

সন্ধ্যার দিকে খাকি পোশাক পরা এক পুলিশ অফিসার আসে। অফিসারটি কেবিনে ঢুকেই উপস্থিত দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলে- দশ মিনিটের জন্য আপনারা একটু বাইরে অপেক্ষা করলে বড়ই মেহেরবানি হয়। পুলিশের অনুরোধে একে একে সবাই বাইরে চলে যায়। ফয়সালের শিয়রের কাছে দাঁড়ানো ছিল নূরী। সব শেষে সেও বাইরে যেতে উদ্দত হলে অফিসারটি বাঁধা দিয়ে বলে- আপনার বাইরে যাবার দরকার নাই, মিসেস আহামেদ। আপনি চেয়ারটা টেনে বসেন। নূরীকে বসতে বলে অফিসার নিজেও একটা চেয়ার টেনে ফয়সালের মাথার কাছে এসে বসে।

- কি ফয়সাল সাহেব আমাকে চিনতে পেরেছেন?

পাঁচ বছর আগে দেখা হোসেন ওসির সাথে আজকের এই তারকা খচিত পুলিশ অফিসারটির তেমন কোন মিল নেই বললেই চলে। ভদ্রলোকের সেই দশাসই ভুড়ি এখন প্রমত্তা পদ্মার মতই অতীত। ডায়াবেটিসের আছরে শুকিয়ে ভদ্রলোক চারভাগের একভাগ হয়ে গেছে। মাথার দিকে তাকালে কদমফুলের কথা মনে হয় না। মনে হয় পারা লাগানো সদ্য কিনে আনা বেলজিয়ামের আয়না একখান। পুরু গোঁফের স্থলে ক্লিন সেভড। নতুন সংযোজন ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি। হোসেন আলীকে ফয়সালের এক নজরে চেনার কথা না। কিন্তু সে ঠিকই চিনতে পারল। পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার পরও সংবাদপত্রের বদৌলতে ভদ্রলোকের ছবি বার কয়েক দেখার সুযোগ হয়েছিল তার। 'কালা মইশ্যা' নামের এক চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে সিনেমাটিক কায়দায় জান বাজি রেখে পাকড়াও করার সুবাদে দেশের প্রতিটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় হোসেন আলীর ছবি ছাপা হয়। 'কালা মইশ্যা' গ্রেফতার হওয়ার পরদিন পুলিশ তাকে সাথে নিয়ে অন্যান্য সহযোগিদের ধরার জন্য তেঁজগাও এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় হাতকড়া পরা অবস্থায় পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে বেঘোরে প্রাণটা হারায় *মইশ্যা*। সেই সুবাদে, ওসি হোসেন আলী পদোন্নতি পেয়ে হয় এএসপি।

একই বছর শ্রেষ্ঠ পুলিশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক প্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জন করে সে। মাস ছয়েক আগে হরতালের দিন বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউএ প্রকাশ্য দিবালোকে সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ঠ্যাঙ্গানোর

মত দুঃসাহসিক কাজ করে হোসেন আবার সংবাদ পত্রের প্রথম পাতা দখল করে নেয়। সরকার বাহাদুর এবারে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে হোসেন আলী পুলিশের অতিরিক্ত আইজির পদটি অলংকৃত করে নিজেকে ধন্য করে এবং সেই সাথে সরকারকেও অকৃতজ্ঞ খেতাবের গ্লানি থেকে মুক্ত করে।
- কি চিনতে পারছেন না? কোই বাৎ নেহি। চিনলেও সহি না চিনলেও সহি। আমার পরিচয়টা দেই তাহলে। আমি হোসেন আলী, পুলিশের অতিরিক্ত আইজি। আপনার এই দুর্ঘটনায় রাষ্ট্র পক্ষ আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আপনি হয়ত জানেন না স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাসপাতালে এসেছিলেন। কিন্তু আপনি তো অজ্ঞান ছিলেন কিছুই জানেন না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের অনেক কথা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকও উনাকে দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী। কি ভাবি সাহেবা চেকটা ভাঙ্গিয়েছেন? সামনে বসা নূরীর দিকে তাকায় হোসেন আলী। কিন্তু নূরীর দিক থেকে কোন সাড়া মেলে না।
- বুঝলেন ফয়সাল সাহেব, হায়াত মউত আল্লাহ পাকের হাতে। আপনার হায়াত আছে বেঁচে গেছেন। ঐ গুন্ডাগুলোর দিলে আল্লাহপাক রমতের আশনাই নাজেল করেছিলেন। তা না হলে আপনার প্রাণে বাঁচার কথা না।
- হোসেন আলী সাহেব আপনি - -
- আরে সাহেব চটবেন না চটবেন না। এ কথাগুলো আমার না, খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। আপানার তো অবশ্যই জানা আছে যে হাদিস, কোরান আর ইসলামি দর্শনের প্রতি উনি কি পরিমাণ আসক্ত। তবে এযাত্রা উনি কথাগুলি সাংবাদিকদের সামনে বলেন নাই। আপনার স্ত্রীর কাছে বলেছেন। বোঝেনই তো সাংবাদিকরা সোজা কথার উলটা মানে করে বসে। হে হে হে।
এবারে নূরী বিরক্তি প্রকাশ করে বলে- আইজি সাহেব আপনি কি বলতে চান একটু তাড়াতাড়ি যদি বলতেন।
- হ্যা হ্যা নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ভাবি সাহেবা। ব্যাপারটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কেসের দেখা শোনার দায়ইত্ব আমার ওপর দিয়েছেন। যাকে বলে অফিসার-ইন-চার্জ। যদিও দায়িত্বটা একজন ওসির ওপর দিলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মন্ত্রীর হুকুম, দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হবে। কি আর করার আছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমি তো একজন কর্মী মাত্র। এক পুলিশ অফিসার হনে কি নাতে - - সরি সরি। এই শালা ডিস দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে খারাপ। কথায় কথায় হিন্দি চলে আসে। হে হে হে। তা যা বলছিলাম, একজন দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার হিসেবে বলতে পারি যে অপরাধী যেই হোক, যত শক্তিশালী হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তদন্ত শুরু করার আগে আপনার একটা স্টেইটমেন্ট নিতে হবে। ঘটনা টা কিভাবে ঘটল, কবে, কখন, কোথায় ঘটল, গুন্ডারা কয়জন ছিল, কাউকে চিনতে পেরেছেন কিনা, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কিনা, কোন শত্রু আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। না না তাড়াহুড়ার কিছু নাই। আপনি একটু সুস্থ হয়ে নিন, পরশু নাগাদ কেউ একজন এসে আপনার বয়ান লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যাবে। কি বলেন?
ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে ফয়সালের। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে হোসেন আলীকে উদ্দেশ্য করে বলে সে- আই জি সাহেব আপনার কথা কি শেষ? আমি একটু ঘুমাব।
- এ্যা হ্যা হ্যা জ্বী স্যার আমার অফিসিয়াল বক্তব্য শেষ। তবে অনুমতি যদি করেন, আনঅফিসিয়ালি কিছু কথা বলতে চাই।
ঈষৎ লজ্জিত ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করে হোসেন। যদিও অনুমতি চাওয়াটা ছিল একটা কথার কথা। ফয়সাল বা নূরীর অনুমতির অপেক্ষা না করেই আবার বলতে শুরু করে সে- ঘটনাটা কে ঘটায়েছে তা আমি আগে না জানলেও পরে জানতে পারছি। আর আপনিতো ভাল করেই জানেন কে কামডা করেছে, কেন করেছে। কাজেই জনাব ঘোর প্যাচের মধ্যে না যেয়ে সরাসরি আসল কথায় আসি। আমি আবার অত ঘোর প্যাচ বুঝি না, সোজা কথার মানুষ আমি। কেনো খামোখা দিগদারি করেন মশাই? কারও সাথে পাঙ্গা নিতে গেলে আগে তার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ খবর নেয়া লাগে। ফয়সালের দু'চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে পুলিশের অতিরিক্ত আই জি হোসেন আলীর কথা বলার ভঙ্গি আর ভাষান্তর লক্ষ্য করে সে।
- আপনার কি ধারণা দুই কলম লিখে আপনি এক্কেবারে দেশে ন্যায় বিচারের নহর বইয়ে দিবেন? কার জোরে এত ফালাফালি করেন এ্যা? আপনার ঐ সম্পাদক কি যেন নাম মনে পড়তেছে না

এখন। আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উনি অলরেডি গনেশ উলটায়ে দিছেন। কি করবেন এখন আপনে? সংবাদ সম্মেলন করবেন? পলটনের মোড়ে মাইক বাজায়ে চিৎকার করে সবাইকে জানাবেন? হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের মারফৎ আইনি লড়াই লড়বেন? এতে কোন লাভ নাই। আর আমিওতো শালার একটা আহাম্মক। কারে কি বলতেছি। এসব করতে চাইলেও করতে পারবেন না। আপনে তো এখন পঙ্গু সাহেব। জজ কোর্টের সামনে বসে দলিল টাইপ করার কাবিলও না এখন আপনে। ফয়সাল সাহেব আপনি একজন ছাপোষা মানুষ। ইচ্ছা করলেও অনেক কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার যিনি প্রতিপক্ষ তিনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন, করতে পারতেন। আপনার ডান হাত আর ডান পা চিরতরে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তলপেটের কাছে স্ট্যাব করা হয়েছে। স্ট্যাব একটা না হয়ে একাধিক হতে পারত, তলপেটে না হয়ে পাকস্থলি বরাবর, কি হৃৎপিন্ড বরাবর হতে পারত। অথচ এরকমটা হয় নাই। কেনো হয় নাই জানেন? কারণ যিনি এই কাজটা করিয়েছেন তিনি চান নাই। চাইলে এতক্ষণ আপনি হাসপাতালে শুয়ে আমার সাথে না, মাটির নীচে চিত হয়ে ফেরেস্তার সাথে বাতচিত করতেন।
আপনাকে মেরে ফেললে কি ভূভারত উলটা পালটা হয়ে যেত? নাকি সারা বাংলাদেশ বংগপোসাগরের তলায় ডুব দিত? দেশে পুলিশ আছে কি করতে? চোখের পলকে মামলা একশ আশি ডিগ্রী ঘুরে যেত। আন নোওন এক পালাতক ক্যারেক্টার কাহিনীর মধ্যে ঢুস করে ঢুকে পড়ত। আপনার স্ত্রীর প্রেমিক চরিত্র। পরদিন পত্রিকায় উঠত স্ত্রীর পরকিয়া প্রেমে বাঁধা দিতে গিয়ে জনপদ পত্রিকার মেধাবী সাংবাদিক খুন। আপনি তো গন কেইস। আর এদিকে আপনার স্ত্রী? পরকিয়া প্রেমের কলংক নিয়ে বেঁচে থাকতে হতো বেচারিকে সারাটা জীবন। এধরণের ঘটনা হরহামেশাই ঘটে আমিও জানি, আপনিও ভাল করেই জানেন। আদিরসের গন্ধ পেয়ে পাবলিক হুমড়ি খেয়ে সংবাদ পত্রের পাতা চেটে পুটে খেত। ডিস দেখা উজবুক পাবলিক সব। একয়দিনের সংবাদপত্র পড়েছেন? ও আমি ভুলেই গেছিলাম, আপনি তো আবার বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলেন। আপনার এই ঘটনায় কার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলি শোনেন। আমি অবশ্য আপনাদের ঐ পত্রিকার ভাষায় বলতে পারব না, আমি আমার ভাষাতেই বলি।

প্রথমেই আপনার জাত ভাই, মানে সাংবাদিকদের কথা বলি। সাংবাদিকদেরতো আবার দল তিনটা। সাদা, কাল আর হলুদ। এই তিন দলের সাংবাদিক ভাইয়েরাই কঠিন কঠিন সব ভাষায় ঘটনার নিন্দা করেছে। এর বেশি উনারা হয়ত আর কিছুই করবেন না। কারণ আপনিতো আবার এই তিন দলের কোন দলের লোকই না। এবারে আসেন সরকারের কথায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওমরাহ থেকে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেছেন যে বিরোধী দল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাচ্ছে। দেশে যত খুন খারাবি, ছিনতাই রাহাজানি, এমনকি সাংবাদিক মারার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা সেই মহাপরিকল্পনারই অংশ। আর খুলনায় এক অজাতশত্রু নেতা হত্যা উপলক্ষে আধবেলা হরতাল শেষে বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন যে, সরকার দেশ জুড়ে বিরোধী দলের নেতা কর্মী নিধনকল্পে এক নীল নক্সা তৈরী করেছে। সেই নীল নক্সা বাস্তবে রুপ দিতে হলে প্রথমেই সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধ করার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। বোঝেন অবস্থাটা একবার- কিয়ের মইধ্যে কি, পান্তা ভাতে বাটার, হে হে হে। উপমা বিক্রিত করে রসিকতা করার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অট্টহাস্যে ফেঁটে পড়ে হোসেন আলী। সামনে শায়িত ফয়সাল বা শিয়রের কাছে দাঁড়ানো নূরী, এদের দু'জনের কেউই কোন কথা বলে না। নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে শুধু।

- হ্যা, তা যা বলতেছিলাম। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন বাড়াবাড়ি করলে আপনি আপনার হাত পা ফিরে পাবেন না। আর যে মারা গেছে সেও জীবিত হবে না। আপনার এবং আপনার কন্যার চিকিৎসা বাবদ অনেক অনেক টাকার দরকার হবে। এত টাকার যোগান দেওয়া আপনার মত মানুষের পক্ষে দ্বিতীয় জন্মেও সম্ভব হবে না। উনি লোক খুব ভাল। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। আপনাকে আর আপনার মেয়েকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করা হবে। আপনি শুধু ব্যাপারটা চেপে যান। ভাবি সাহেবা আপনি আপনার স্বামীকে বোঝান। এমনিতে না বোঝে কান্না কাটি করে বোঝান, কান্না কাটিতে না বোঝে ঝগড়া ঝাটি করেন, ঝগড়ায় কাজ না হয় বাপের বাড়ি চলে যান রাগ করে। যা হয় একটা কিছু করেন। এতে

আপনাদেরও মঙ্গল অন্য সবারই মঙ্গল। আমি এখন উঠব ভাবি। ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবেন, আমি দিন দুই পরে আবার আসব। ভাল থাকবেন, স্লামালেকুম।

হোসেন আলি চলে যাবার পর ফয়সাল কোন কথা বলতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে নূরীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নূরী এগিয়ে এসে ফয়সালের কপালে, গালে হাত বোলায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না ফয়সাল, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

॥তের॥

তিন দিন পরের কথা। অনেকটা সুস্থ্য হয়ে উঠেছে ফয়সাল। ডান হাতটা নড়াচড়া করতে তেমন অসুবিধা হয় না। ডান পায়েও একটু একটু বোধ ফিরে আসছে, যদিও পা নাড়ানোর মত অবস্থা এখনও হয়নি। গতকাল রাতে একরকম জোর করেই নূরীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সকালে উঠে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল ফয়সাল। হঠাৎ পত্রিকার প্রথম পাতায় ডান পাশে সিঙ্গেল কলামে একটা সংবাদের দিকে চোখ আটকে যায় তার। ‘ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে ধনাড্য শিল্পপতির কন্যার আত্মহত্যা’- শিরোনামের ওপর ফারহানার ছবি। বুকের ভেতরে ধক ধক হাতুরী পেটা শব্দ হয়। সংবাদ পত্র ধরা হাত খানা থর থর কাঁপতে থাকে। কম্পিত হাতেই খবরটা পড়া শুরু করে সে-

‘গতকাল রাত দশটায় ফারহানা দেওয়ান (২০) নামের এক যুবতি তার লালমাটিয়াস্থ বাসভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। উল্লেখ্য ফারহানা দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি দেওয়ান গ্রুপ ওব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্নধার ইসমাঈল দেওয়ানের একমাত্র কন্যা। ফারহানার আত্মহত্যার কোন কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দেওয়ান পরিবারের একজন সদস্য এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে যে আত্মহত্যার মূল কারণ প্রেম ঘটিত। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রাত দশটার দিকে বাড়ির সবাই যখন টিভি দেখছিল, তখন ভারি কিছু পতনের শব্দ শুনে সবাই দৌড়ে নীচে আসে। ফারহানাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ধরাধরি করে গাড়িতে উঠিয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আনার পর জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করে। হাসপাতাল থেকে মৃত দেহ পোস্টমর্টমের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। এখবর লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।’

সংবাদটা পড়া শেষ হলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে ফয়সাল। ফুলের মত পূত পবিত্র নিস্পাপ মুখ খানি আর সেদিন সন্ধ্যায় ফারহানার সাথে তার কথপোকথনের স্মৃতি বার বার মনের পর্দায় ঘুর পাক খেতে থাকে। কি দৃঢ়চেতা মনোবল, ধারালো যুক্তি অথচ অমায়িক তার বহিঃপ্রকাশ। বেঁচে থাকার এক অসাধারণ দর্শনের সঙ্গে যার বসবাস, হঠাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাধ কেন জাগল তার ভেতর? কেন, কেন, কেন?

বিকেলে দু’জন সহকর্মীর সাথে খায়রুল বাশার সাহেব আসে। এসেই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে- সরি ফয়সাল, গতকাল আসতে পারিনি। একটু ব্যস্ত ছিলাম, তোমার ব্যাপারেই। আজকের পত্রিকা দেখেছ কিনা জানিনা। তোমার চিকিৎসার পারপাসে একটা সাহায্য তহবিল খোলা হয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে এর মধ্যেই সাড়া আসা শুরু হয়েছে। এই দেখ বেশ কিছু ই-মেইল আর এই, এই যে তোমার নামে একটা চিঠি, আজকের ডাকেই এসেছে। কয়েকটা ই-মেইল এর প্রিন্ট আউট আর একটা খাম ফয়সালের হাতে তুলে দেয় খায়রুল বাশার। খামটা উলটে পালটে দেখে ফয়সাল। প্রেরকের কোন নাম নেই। শুধু লেখা - ঢাকা, বাংলাদেশ। খাম আর ই-মেইল গুলো বালিশের তলায় রেখে দেয় ফয়সাল।

- আরেকটা খবর ফয়সাল, পড়েছ নিশ্চয়ই। জানিনা আমাদের খুশি হওয়া উচিত, না দুঃখিত হওয়া উচিত। যে কোন মৃত্যু সংবাদই দুঃখজনক। কিন্তু তারপরও বলি, দেখ আল্লাহ পাকের কি বিচার। কোরান মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বারবার বলেছেন যে তিনি ন্যায় বিচারক, তিনিই ন্যায় বিচারক। সে যাই হোক, ঘাবড়ানোর কিছু নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। দুনিয়াতে যেমন মন্দ মানুষের সয়লাব, তেমনি ভাল মানুষেরও কোন অভাব নাই। তোমাকে লেখা ই-মেইল গুলা পড়লেই বুঝতে পারবা, জগতে ভাল মানুষের এখনও কোন কমতি নাই। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও মানুষ গুলার নিজের দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কত দরদ।

রাত গভীর, থমথমে নীরবতা। একাকি বিছানায় শুয়ে আছে ফয়সাল। ঘুম আসছে না

কিছুতেই। আজকে দুপুরে টুনটুনি এসেছিল তার মামীর সাথে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বড় করে নিঃশ্বাস নিয়েছিল ফয়সাল। দু'চোখের পানি সম্বরণ করতে পারেনি সে। মায়ার বাঁধন- বড্ড কঠিন আর শক্ত এই বাঁধন। এই মুহূর্তে টুনির কথা মনে আসতেই আবারও দু'চোখ সিক্ত হয়ে আসে। মাঝরাতের শুনশান নিস্তব্ধতা খান খান চূর্ন বিচূর্ন করে কাছে ধারের কোন ওয়ার্ড বা কেবিন থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। প্রায় সাথে সাথেই করিডরে পদচারণার শব্দ। এই মাত্র ধরনী থেকে হয়ত কোন মানব সন্তানের বিদায় ঘটল। আবার একই সময়ে, এই হাসপাতালের অন্য কোন কামরায়, অথবা অন্য কোন জায়গায়, অন্য কোন হাসপাতালে, অথবা গ্রামের জীর্ন কোন কুটিরে হয়ত চিৎকার করে উঠেছে নবজাতক কোন মানব শিশু- জন্ম মাত্রই সুতীব্র চিৎকার। জন্ম মৃত্যুর কি এক বিচিত্র খেলা। বাশার সাহেবের দিয়ে যাওয়া ই-মেইল আর চিঠির কথা মনে পড়ে ফয়সালের। বালিশের তলায় হাত দিয়ে কাগজ গুলো বের করে সে। একে একে সব গুলো মেইল সে পড়ে। দুবাই, কাতার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপোর, ইউ এস আর ক্যানাডা থেকে প্রবাসী বাঙ্গালিরা তার প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে। চিঠি গুলো পড়ে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে ফয়সাল। এবারে নাম ঠিকানাহীন খামটা হাতে নিয়ে দাঁত ঠোঁটের সমন্বয়ে যত্ন করে ছিড়ে, খাম থকে চিঠিটা বের করে আনে। সাদা কাগজে ঝকঝকে, গোটা গোটা, মেয়েলি ধাঁচের হাতের লেখা। পড়তে শুরু করে ফয়সাল।

প্রিয় ফয়সাল সাহেব,
কেমন আছেন? প্রশ্নটা অবশ্য হাস্যকর হয়েগেল। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরে আসা, হাসপাতালে লীন একজন মানুষ যে কী রকম থাকতে পারে তা আমার অন্তত কম জানার কথা না। মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাগানে বসে আমার আর আপনার কথপোকথন গুলো? সেদিন আমি বলেছিলাম- একবার না দু দু'বার আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। দ্বিতীয়বারের কথা তো আপনি জানেনই। এবারে প্রথম বারের কথা বলি শোনেন। তখন আমি খুব ছোট। ক্লাশ টুতে পড়ি। গ্রামে গেছি বেড়াতে। তখন আমাদের বাড়িতে দালান ছিল না। বেশ কয়েকটা বড় বড় টিনের ঘর ছিল। বাড়ির দক্ষিণে একটা পুকুর ছিল। এখন আর নেই, পুকুরটা ভরাট হয়ে গেছে। বর্ষা মরশুম। পুকুরে বৃষ্টির পানি জমে থৈ থৈ। সাতার জানতাম না। কিন্তু শিশু মন, অজানাকে জানার তীব্র আকাংখা। বাড়ির বড়দের বাঁধা নিষেধ উপেক্ষা করে বার বার ছুটে যেতাম পুকুর ধারে। একদিন নির্জন দুপুরে, বাড়ির সবাই ঘুম। সবার অগোচরে পুকুর পাড়ে এসে হাজির হলাম। পুকুরে পানিতে টুইটুম্বুর। পারে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়ালে প্রায় ছোঁয়া যায়। প্রতিদিনই চেষ্টা করি হাত বাড়িয়ে ছুঁতে, কিন্তু নাগাল পাইনা। সেদিনও চেষ্টা করছিলাম। হঠাতই আমি যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলাম, সেখান থেকে এক চাপ মাটি ভেঙ্গে আমাকে সহ পানিতে আছড়ে পড়ল। আমি তলিয়ে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি। তখনও জন্ম মৃতু সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না আমার। কিন্তু তবু বুঝতে পারলাম আমার মন্দ কিছু হতে যাচ্ছে, এর থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতে হবে। হাত পা ছুড়ে নিজেকে ভাসিয়ে রাখার, বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমি। জলপ্রপাতের মত পানি ঢুকছে আমার পেটে, কমে আসছে হাত পা ছোঁড়ার মাত্রা, আমি মারা যাচ্ছি। আচমকা কার যেন স্পর্শ পেলাম, কেউ একজন আমাকে টেনে পানি থেকে ডাঙ্গায় তুলল- আমি বেঁচে গেলাম। যে মানুষটি আমাকে পানি থেকে টেনে তুলেছিল সে কে জানেন? খোরা পাগলনি। পাগলি তখন নতুন নতুন আমাদের গ্রামে এসেছে কিনা তা সঠিক স্মরণ নেই। তবে জটা ধরা চুল, বড় বড় চোখ, হাতে মাটির খোরা, বিড় বিড় করে কি যেন বলে- দেখলেই কেমন যেন ভয় করত। অবশ্য সেদিনের পর থেকে আর ভয় করত না। খোরা পাগলনি আমার জন্য কতটুকু করল তা বুঝা ঐ বয়সে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন বুঝলাম, তখন এও বুঝলাম- আমার আর পাগলির মধ্যে স্বচ্ছ অথচ দূর্ভেদ্য এক দেওয়াল। আমি চাইলেও পাগলিকে জড়িয়ে ধরতে পারব না। ঘরে এনে সোফায় বসাতে পারব না, দামি পালংকের গদিওয়ালা বিছানায় ঘুমুতে দিতে পারব না। দেশের সেরা মানসিক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারব না। মানুষের তৈরী সামাজিক বৈষম্য মানুষকে কতটা অমানুষ করে রেখেছে, ভেবেছেন একবার?
এরপর অনেকগুলো দিন, মাস আর বছর পেরিয়ে গেছে। আমি বড় হয়েছি। দেশের সবচেয়ে দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে পড়ালেখা করছি। শিক্ষিত হওয়া যতটুকু না জরুরী,

সামাজিক স্ট্যাটাসের পেন্ডুলাম সচল রাখা তার চেয়ে বেশি জরুরী। আমার বাবার অনেক টাকা। বুদ্ধি হবার পর থেকে আমার বাবা আমাদের দুই ভাইবোনের কোন শখ অপূর্ণ রাখেননি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। স্বার্থপরের মত তা ভোগও করেছি। একদিন জানতে পারলাম আমার দুইটা কিডনিই নষ্ট। আমার বাবার একটা কিডনি ডিস ফাংসনাল অনেক আগে থেকেই। সম্ভবত এ রোগটা আমাদের বংশ গত, জেনেটিক। যাই হোক বাঁচতে হলে অন্তত একটা কিডনি ট্রানসপ্ল্যান্ট করতে হবে। আমার কি চাই, বাঁচার জন্য, শখ পূরনের জন্য না। অনেক চেষ্টা করেও মলছে না। ধীরে ধীরে মরতে চলছি আমি। আমার বাবা ইসমাঈল দেওয়ান মানুষ হিসেবে কেমন তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু পিতা হিসেবে তাঁর তুলনা কেবল তিনিই। জগৎ সংসারের শ্রেষ্ঠ পিতা হচ্ছেন আমার পিতা ঈসমাইল দেওয়ান। উনার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বের হল। অপরিচিতা এক দয়ালু মহিলা কিডনি বিক্রি করতে রাজি হলেন। খুব দ্রুততার সাথে আমার ক্ষয়ে যাওয়া দুটো কিডনির জায়গায় একটা কিডনি বসানো হল। আমার বাবার আন্তরিক চেষ্টায়, অপরিচিতা এক নারীর দয়ায়, মেডিকেল সায়েন্সের যাদু এবং সর্বোপরি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি দ্বিতীয়বারের মত বেঁচে উঠলাম। এর পরের কাহিনী বেশ সুখকর হওয়ার কথা ছিল। উপন্যাস বা সিনেমার মত হ্যাপী এন্ডিং। কিন্তু বাধ সাধল একটা লাশ, বেওয়ারিশ লাশ। আমি জানিনা আপনি কিভাবে এই লাশের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। যেভাবেই হোক এক পর্যায়ে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হল, কথা হল। এতদিন জানতাম মেহেরুন্নেসা নামের এক মহিলার বদৌলতে আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আপনি এসে বললেন অন্য কথা। খোরা পাগলনির নাম না বলে আর কারো নাম বললে আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। ভাবতাম আমার শিল্পপতি পিতার হাজারো শত্রুর কোন একজনের অপপ্রচার মাত্র। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, সেদিন বাগানে আমার সাথে একজন বয়স্কা মহিলা বসে ছিলেন। আপনি আসার সাথে সাথে উনি উঠে ভেতরে চলে গেছিলেন। মহিলার নাম আমেনা ফুপু। আমার আপন ফুপু না, বাবার দুঃসম্পর্কের বোন। মা মারা যাবার পর এই মহিলাই আমাদের দুই ভাই বোনকে আগলে রেখেছেন ছায়ার মত। পারিবারিক যে কোন ব্যাপারে বাবা উনার সাথে কম বেশি আলাপ করে থাকেন। আপনি চলে যাবার পর, আমি ফুপুকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করি। প্রথমে বলতে না চাইলেও পরে ফুপু সব স্বীকার করেন।

আমার অসুখের কারণে চিন্তা ভাবনা করতে করতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন বাবা। শহরের বাইরে কোলাহল মুক্ত পরিবেশে একটা দিনের জন্য হলেও বিশ্রাম নিতে গ্রামের বাড়িতে গেছিলেন। দৈবক্রমে পাগলি সামনে এসে গেল। ব্যবসায়ী মানুষ, বুদ্ধি দ্রুত খেলে মাথায়। একটা সুযোগ নেওয়াই যাক না। আমি জানিনা পাগলি এমনিতেই বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বসেছিল নাকি, আমার অসুখ বলায় গাড়িতে চড়েছিল। যাইহোক, সবার অগোচরে পাগলিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হল। সৌভাগ্যক্রমেই বলেন আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বলেন অথবা দৈবক্রমেই বলেন ক্লিনিকালি সব কিছু আমার পক্ষে চলে গেল। আমাকে শুধু জানানো হল, কিডনি পাওয়া গেছে। কিডনি কোথা থেকে, কিভাবে আসল তা আমাকে জানানো হয়নি। আর আমিও জানার প্রয়োজন মনে করিনি। ডঃ চৌধুরী আমার বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু। ভদ্রলোকের সহযোগিতায় পিজিতে অতি দ্রুত ট্রানসপ্ল্যান্ট সারা হল, আমি বেঁচে গেলাম। পাগলি কে মারার কোন ইচ্ছা বাবার ছিল না। সব ঠিক ঠাক মত হয়ে গেলে উনি হয়ত পাগলিকে মানসিক চিকিৎসা করাতেন। হয়ত বলছি কেন, আমি নিশ্চিত- এরকমটাই হত। কিন্তু আশ্চর্য, যা হবার তা হলো না, যা না হবার তা হয়ে গেল। অযত্নে পাগলি মারা গেল, আমাকে দ্বিতীয়বারের মত নতনু জীবন দিয়ে। পাগলি মারা যাওয়ায় বাবাকে সব কিছু নতুন করে হিসেব করতে হল। সময় সময় অতি বুদ্ধিমান মানুষও বোকার মত কাজ করে বসে। আমার বাবাও সেরকমই বোকার মত অনেক কিছু করে বসলেন। একপর্যায়ে আপনি লাশের ছবি খবরের কাগজে ছাপলেন। পরের ঘটনা সবটুকুই আপনার জানা।

সব কিছু শোনার পর অনেক ভেবেছি। পিতা হিসেবে আমার বাবা যা করেছেন তার হয়ত বিচার বিশ্লেশন চলতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে যা করেছেন, তা সজ্ঞায়িত করতে কোন বিচার বিশ্লেসন বা যুক্তি তর্কের দরকার পড়ে না। আমার বাবা একজন খুনী- এ কোলড ব্লাডেড মার্ডারার। যুক্তি তর্ক দিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম অনেক। এই পৃথিবীতে পাগলির যদি বেঁচে থাকার কোন অধিকার না থাকে তবে আমারও বেঁচে থাকার কোন অধিকার নাই। এই পৃথিবীতে

পারিনি, কিন্তু অন্য পৃথিবীতে নিশ্চয়ই খোরা পাগলনির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারব- এ আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি আমার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।
আপনার প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার করারও কোন পথ আমার জানা নাই। এই চিঠি আপনাকে হয়ত সেই পথ দেখাতে পারে। ফয়সাল সাহেব, আমাদের জীবনটা শুধুই অনিশ্চয়তায় ভরা। আমি জানিনা এই চিঠি সত্যি সত্যি আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছুবে কি না। যদি সব অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে এই চিঠিটা আপনার হাতে পৌঁছেই থাকে তবে বলছি- আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। শুভ বিদায়।

ফারহানা
১৬-১০-২০০৩

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে ফয়সাল। সে দেখে- ঢাকা শহরেরই কোন এক জায়গায়, দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে সে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা দুটোর একটা একেবারেই নিরিবিলি। কোন লোক জন নেই, ব্যস্ততা নেই, যানবাহনের কোলাহল নেই। বয়সের ভারে নতজানু অতিশয় বৃদ্ধ এক লোক লাঠিতে ভর দিয়ে নিরিবিলি রাস্তাটি ধরে ধুকতে ধুকতে হেঁটে যাচ্ছে। অন্য রাস্তাটি ভীষন ব্যস্ত। পায়ে হাটা মানুষ, চিৎকার চেচামেচি, যানবাহনের ভিড়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে যত মানুষ যাচ্ছে, হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে তাদের কারুরই চোখের জায়গায় চোখ নাই, কানের জায়গায় কান নাই। স্বপ্নের মধ্যেই ভাবে ফয়সাল- স্বপ্ন দেখছে না তো সে? নিজের শরীরে চিমটি কাটে একবার। নাহ ব্যথা লাগছে। তাহলে স্বপ্ন না সত্যি, নিশ্চিত হয় সে। রাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটির পেছনে কয়েকশ গজ ধুরে একটা মাল বোঝাই ট্রাক পোঁ পোঁ হর্ন বাজিয়ে ধেয়ে আসছে। লোকটি তবু হেটেই যাচ্ছে, হর্ন শুনতে পাচ্ছে না নাকি? ওহো শুনবে কি করে, লোকটির তো কানই নেই। এসে পড়েছে প্রায় ট্রাকটা, মাত্র কয়েক গজ পেছনে। লোকটি হঠাৎ তার দু'হাত পকেটে ঢোকায়। ভেলকিবাজির মত এক জোড়া কান হাতের মধ্যে দেখা যায়। লোকটি কান জোড়া জায়গা মত সেট করে ফেলে। এবারে হর্ন শুনতে পায় সে। এক লাফে রাস্তার এক পাশে সড়ে দাঁড়ায়। সা করে তীব্র বেগে ট্রাকটি পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ভদ্রলোক আবার তার কান দুটো পকেটে ফেরত দিয়ে আগের মত পথ চলতে থাকে। ফয়সাল যেখানটায় দাঁড়ানো তার খুব কাছেই রাস্তায় বিরাট গর্ত, গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। অন্ধকারে পথচারীদের জন্য জায়গাটা বেশ বিপজ্জনক। এইমাত্র ফয়সালের ঠিক পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হায় আল্লাহ লোকটার তো চোখ নাই। এভাবে হাঁটতে থাকলে সোজাসুজি গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে। ও ভাই, এই যে, শোনেন- পেছন থেকে ডাকে ফয়সাল। কিন্তু ভদ্রলোকের কান না থাকায় কিছুই শুনতে পায় না। লোকটি প্রায় গর্তের কাছাকাছি চলে গেছে, এই তো কয়েক কদম মাত্র। আচমকা থেমে যায় ভদ্রলোক। যাদু জানে নাকি মানুষটা, মনে মনে ভাবে ফয়সাল। আবারও চমকাবার পালা ফয়সালের। লোকটি তার পকেটে হাত দিয়ে এক জোড়া চোখ বের করে এনেছে। তড়িৎ চোখ জোড়া জায়গা মত বসে যায়। গর্ত পাশ কাটিয়ে নিরাপদে জায়গাটি অতিক্রম করে পথচারী ভদ্রলোক। এরপর চোখ দু'টো খুলে এনে পকেটে চালান দিয়ে আগের মতই পথ চলতে থাকে।

পথিচারীদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এবারে নিজের দিকে মনযোগ দেয় ফয়সাল। চোখ আর কানের জায়গা স্পর্শ করে টের পায় অংগ দুটোর অস্তিত্ব। ফয়সালের বাম বগলে কাঠের স্ক্র্যাচ। ডান হাত আর পাটা একেবারেই অচল। তবু একটা কিছু অবলম্বন করে সে হাঁটতে পারে, দুচোখ দিয়ে দিগন্ত জোড়া অবলোকন করতে পারে, দু'কান দিয়ে সব শুনতে পারে। ভেতর থেকে কে যেন তাকে তাগিদ দেয়- দাঁড়িয়ে কেন ফয়সাল, সামনে এগোও। সেই তাগিদে সাড়া দিতে গিয়েও থমকে যায় সে। দুই পথের সংযোগে দাঁড়িয়ে আছে সে। এক পথ জনবহুল, কিন্তু তারা সব অন্দ্ধ আর বধির। আর দ্বিতীয় পথ নীরব, জনমানব শূন্য। কে জানে কি অপেক্ষা করছে সেই অব্যবহৃত পথের শেষ প্রান্তে। স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে ফয়সাল- কোন পথে এগুবে সে?

Toronto
mkhan1969@yahoo.com